বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-বিষয়ক একনিষ্ঠ গবেষক অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন নিছক বহুগ্রন্থ-প্রণেতা নন, তাঁর ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে ঘটেছে অনেক অজানা অধ্যায়ের উন্মোচন, অন্ধকার দিকের ওপর নতুন আলোকসম্পাত। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালের বিশ্ব ছিল আজকের দুনিয়া থেকে একেবারে আলাদা, বাঙালির জীবনপণ ন্যায়যুদ্ধ দেশে দেশে নাগরিক সমাজের মনোযোগ ও সহানুভূতি অর্জন করলেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকার নিয়েছিল বিরোধী অবস্থান। প্রতিবেশী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ জোর সমর্থন জানালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্ব ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রবল বিরোধী। এরই অনুগামী হয়েছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব, যার অধিকাংশ ছিল তাঁবেদার রাষ্ট্র, মার্কিন অনুগত এবং ইসলামের নামে পাকিস্তান রক্ষায় সোচ্চার ও সক্রিয়। এমনি পটভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধকালে মুসলিম বিশ্বের অবস্থানের সবিস্তার পরিচয় মেলে ধরেছেন লেখক। লেখকের অভিনিবেশ গবেষণায় মধ্যপন্থি কতক দেশের প্রসঙ্গও উঠে আসে যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান নিলেও গণহত্যার অনুমোদন করেনি। এই গ্রন্থের পাঠ মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব-বাস্তবতার অনালোচিত অধ্যায় যেমন মেলে ধরে, তেমনি ফুটিয়ে তোলে ইতিহাসের সত্য, কত বাধা উজিয়ে বাংলাদেশকে পৌঁছতে হয়েছিল বিজয়ে।





প্রচ্ছদ-শিল্পী : অশোক কর্মকার
প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
ISBN 984-70124 0185-9



মূল্য : দুইশ' টাকা মাত্র

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
হরফ বিন্যাস কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

উৎসর্গ

আমার পরবর্তী প্রজন্ম ভ্রাতৃ ও ভগ্নিকুলের
ডলি, লাবু, বাবু, মলি, পলি, তামান্না,
জয়, রাফি, কথা, নাফিউ, তাসনিম, শাহির

সকলের শুভকামনায়

সূচি

ভূ মি কা

সমকালীন বিশ্বে যে কোনো দেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু সে দেশেই নয় বরং বিশ্বকেও প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সত্তর দশকের বিশ্ব রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তৎকালীন তিন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থে পাকিস্তান সঙ্কট ও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছে। গণতন্ত্রের দাবিদার যুক্তরাষ্ট্র, শোষিত মানুষের দেশ বলে দাবিদার গণচীন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেনি। অন্য পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল বাঙালির পক্ষে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে প্রথম দুই রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই পাকিস্তানের পক্ষ নেয়।

তবে এটি ঠিক, ইন্দোনেশিয়া থেকে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলো মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ব্যাপারে একই ধরনের নীতি গ্রহণ করেনি। পরাশক্তির জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা থেকে রুশ-ভারতের আধিপত্য বিস্তার রোধ করতে চেয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়া যুদ্ধে ভারতকে সহায়তার মাধ্যমে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রভাব বলয় প্রসারিত করতে চেয়েছে। অবশ্য মুসলিম বিশ্বের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য না থাকলেও নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা রুশ-ভারত আধিপত্য বিস্তার রোধের পরিকল্পনায় চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে। এক্ষেত্রে যুদ্ধের পক্ষ যেহেতু পাকিস্তান সেহেতু তাদের প্রতি সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে মুসলিম বিশ্ব। পাকিস্তানকে সমর্থনের পেছনে ধর্মীয় কারণের চেয়ে বরং মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তার ইস্যু ও জাতীয় স্বার্থ বেশি ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তানের প্রতি নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. রক্ষণশীল দেশ : এ ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, আরব আমিরাত, মরক্কো ও গাম্বিয়া। এদের মধ্যে সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, জর্ডান ও তুরস্ক শুধু সমর্থন এবং সহযোগিতা নয় পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। ২. মধ্যপন্থি দেশ : এ ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল আলজেরিয়া, তৎকালীন দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, লেবানন, আফগানিস্তান, মিসর, ইরাক, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। এরা পাকিস্তান সামরিক জান্তার গণহত্যাকে সমর্থন দেয়নি। এসব দেশের সরকার পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিবৃতি দিলেও গণহত্যা অনুমোদন

করেনি। বরং গণমাধ্যম লেখালেখির মাধ্যমে গণহত্যার বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং কখনো কখনো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ৩. তৃতীয় আর এক শ্রেণির মুসলিম দেশ মৌন ভূমিকা পালন করে। সোমালিয়া, উত্তর ইয়েমেন, শাদ, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল এ ভাগের অন্তর্ভুক্ত। অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব না থাকায় এ দেশগুলো কারো পক্ষেই সক্রিয় থাকেনি। তবে রক্ষণশীল দেশগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে নৈতিক, আর্থিক, অস্ত্র সহযোগিতা এবং শেষ দিকে জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বাঙালি হত্যাযজ্ঞে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৈঠক, বিবৃতি, যুক্ত ইশতেহারের মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন, গণহত্যা কোনোটিই এ সংস্থার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। সংস্থার প্রভাবশালী সদস্যরা পাকিস্তানের প্রতি নৈতিক, আর্থিক ও অস্ত্র সহযোগিতার দ্বারা বাঙালি হত্যাযজ্ঞের পক্ষে কাজ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব বইটিতে মোট আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। কী কারণে ওআইসি পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণ করেছিল তার কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে শুরুতে। এরপর পর্যায়ক্রমে ওআইসি গঠন, ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সংস্থাটিতে কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত খতিয়ান রয়েছে। এরপর মূল আলোচনা যেখানে মুক্তিযুদ্ধে সংস্থার ভূমিকা ধারানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় হিসেবে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ দুটি দেশের সরকার কখনো মধ্যপন্থা, কখনো নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছে। শুরুতে বাংলাদেশ ইস্যুকে পাকিস্তানের মতোই অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখলেও দেশ দুটির গণমাধ্যম, বিরোধী দলের কারণে তারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে অচলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা করেছেন। ইন্দোনেশিয়া মধ্যস্থতার প্রস্তাবও দিয়েছে। জাতিসংঘে দেশটির ভূমিকা ছিল গঠনমূলক। এ দেশটিতে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তাদের কারণে সরকারের এ নীতি গ্রহণ সহজ হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার বিরোধী দল এবং ছাত্র সমাজও বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে সৌদি আরবের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ দেশটি স্বাধীনতা, বিপ্লব, প্রগতির বিপক্ষে সবসময় যেমন অবস্থান নেয় মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বলা যায় বাংলাদেশের শীর্ষ বিরোধী দেশ ছিল এটি। এ অধ্যায়ে সৌদি আরবের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ, মুক্তিযুদ্ধে সৌদি ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তানকে অর্থ, অস্ত্র সহযোগিতা দিয়ে যে সাহায্য করেছে দলিল-দস্তাবেজের মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হয়েছে। পরের অধ্যায়ে অন্য আরব রাষ্ট্র— ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, কুয়েত, আবুধাবি, জর্ডান ও পিএলওর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে জর্ডান কট্টর পাকিস্তানপন্থি দেশ। একাত্তরের

অক্টোবর থেকে পাকিস্তানকে সরাসরি মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ করে দেশটি।

সৌদি আরবের মতো ইরানও পাকিস্তানকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তাকারী দেশ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে দেশটি নিজের বিমান ঘাঁটি সরাসরি পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে ব্যবহার করতে দেয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইরানের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ, মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এক সময়ের প্রভাবশালী রাষ্ট্র তুরস্কের একাত্তরে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব না থাকলেও মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব রয়েছে। একাত্তরে দেশটির ভূমিকা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো নিজেরাই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে মিসর মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। মিসরের পত্রপত্রিকা ছিল বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে লিবিয়া পাকিস্তানকে শুধু সমর্থনের মধ্যে নিজকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে সুদান, ঘানা, মরক্কোসহ আফ্রিকার ছোট দেশগুলো অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো শুধু বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন দেয়। অষ্টম অধ্যায় থেকে আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোর এই ভূমিকা সংক্ষেপে হলেও জানা যাবে।

এ গ্রন্থভুক্ত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সৌদি আরবের ভূমিকা' শিরোনামের প্রবন্ধটি যৌথভাবে আমি এবং ড. এ. কে. এম. গোলাম রব্বানী রচনা করি। *সমাজ নিরীক্ষণ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ৭০ নম্বর, নভেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ সুযোগে আমি প্রফেসর রব্বানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ওআইসির ভূমিকা' *মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু গবেষণা ইনস্টিটিউট পত্রিকায়* (সংখ্যা ১ নম্বর ৩, জুলাই ২০০০) প্রকাশিত হয়। ইন্দোনেশিয়া প্রবন্ধটি *ইতিহাস সমিতি পত্রিকায়* (সংখ্যা ২৭-২৮, ডিসেম্বর ২০০৫) প্রকাশিত হয়। ইরান একই পত্রিকায় ৩১-৩২ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরানের ভূমিকা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আমি এসব পত্রিকার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রসঙ্গক্রমে বইটির কিছু সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে বলতে হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা নিয়ে তেমন লেখা বাংলা বা অন্য ভাষায় নেই। মূলত দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম দেশগুলোর সরকার ব্যবস্থা, ভাষা, অনগ্রসরতা মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তাদের সম্পৃক্ততা তেমন প্রকাশিত হয়নি। আমাকে মূলত দেশ-বিদেশের পত্রিকা, কিছু দলিলপত্রের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের বেশ কিছু পত্রিকা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ অ্যান্ড সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর স্যোসাল সায়েন্স রিসার্চ (ICSSR), মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়া স্টাডিজ, নেতাজি ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নেহরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, কাউন্সিল অব ওয়াল্ড অ্যাফেয়ার্স, আইডিএসএ (IDSA) গ্রন্থাগার, জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া স্টাডিজ সেন্টার থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ

করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের করাচিতে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (PIIA), করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মাহমুদ হোসেন লাইব্রেরি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ লাইব্রেরি, লিয়াকত মেমোরিয়াল লাইব্রেরি থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। এসব গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রবন্ধগুলো কম্পোজে সহায়তা করেছেন আমার এম.ফিল ছাত্র ও বর্তমানে কুমুদিনী সরকারি কলেজের ইতিহাসের প্রভাষক এ.টি.এম জায়েদ হোসেন, ইতিহাস সমিতির অফিস এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা এ.টি.এম. যাবের হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হলের উচ্চমান সহকারী আজিজুর রহমান। এ তিনজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ে কম্পোজ ও ছবি বিন্যাসে সহায়তা করেছেন আবদুল মতিন। ভাষা ও বানানরীতির ক্ষেত্রে বরাবরের মতো জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিনিয়র অফিসার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রাক্তন ছাত্র নারায়ণ চন্দ্র দাস এবং আমার ছাত্রী বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রভাষক সাঈদা নাসরিন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল। বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্র থ ম অ ধ্যা য়

ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)

আধুনিক বিশ্বের প্রথম ধর্মভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (Organization of Islamic Conference, OIC) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির সঙ্গে শুরু থেকেই জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংস্থা বিভিন্ন বৈঠক, বিবৃতি ও যুক্ত ইশতেহারসহ সকল সময় পাকিস্তানপন্থি ভূমিকা গ্রহণ করে। পাকিস্তানের দু'অংশের বিরোধের প্রকৃতি মূল্যায়ন না করে, সংস্থার মহাসচিব ও প্রতিনিধি দলের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ সরেজমিনে পরিদর্শনের পরও নিরপেক্ষ ভূমিকা না নিয়ে এই সংস্থা একপেশে ভূমিকা নেয়। বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্লোগান নিয়ে এ সংস্থার জন্ম হলেও বাংলাদেশের ৭ কোটি মুসলমানের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসলীলা সংস্থার সদস্যদের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে সংস্থার মাধ্যমে ও সংস্থার প্রভাবশালী সদস্যরা পাকিস্তানের প্রতি নৈতিক, আর্থিক ও অস্ত্র সহযোগিতা করে বাঙালি নিধনে পরোক্ষভাবে হলেও সহায়তা করে। একাত্তরের অক্টোবর মাসে সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, জর্ডানের সরবরাহকৃত অস্ত্র পাকিস্তান বাংলাদেশের মুসলমানসহ নিরীহ বাঙালিদের হত্যার কাজে ব্যবহার করে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ওআইসির কাছে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তারা 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার' স্বার্থে বাংলাদেশের আবেদনে সাড়া দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। অথচ ওআইসির নিরপেক্ষ ভূমিকা বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারতো।

এ অধ্যায়ে তিনটি প্রধান দিক আলোচনায় আনা হয়েছে। **প্রথমত,** ওআইসির পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ; **দ্বিতীয়ত,** ওআইসি গঠন ও ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত

ওআইসিতে পাকিস্তানের ভূমিকা এবং **তৃতীয়ত**, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সংস্থার ভূমিকা।

মুক্তিযুদ্ধে ওআইসির সদস্যদের ভূমিকার ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা যায়। মূলত সদস্যদের তৎপরতার ভিত্তিতে এ বিভাজন করা হয়েছে। ১. অস্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা প্রদানকারী; ২. নৈতিক ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতাকারী দেশ; ৩. মোটামুটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনকারী দেশ এবং ৪. মৌন ভূমিকা পালনকারী দেশ।

সারণি-১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ওআইসির সদস্যদের ভূমিকা

ভূমিকার প্রকৃতি	দেশের নাম
১. অস্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা	সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, জর্ডান ও তুরস্ক
২. নৈতিক ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা	কুয়েত, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, মরক্কো
৩. মোটামুটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনকারী	ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর, সুদান, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক
৪. মৌন ভূমিকা	সোমালিয়া, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, দক্ষিণ ইয়েমেন, শাদ, তিউনেশিয়া, নাইজেরিয়া, গায়েনা, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল ও মালি

Source : *Pakistan Horizon*, Vol.XXIV, No.2-4, 1971

১. ওআইসির পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ

ওআইসির পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করে।

প্রথমত, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের জন্য ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠা ওআইসি ও তাঁর সদস্যদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের দু'অংশের ইসলামি সংহতিবিরোধী রুশ-ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। প্যাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধকে 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র' এবং মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় চর', 'কাফের' আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে পরিপূর্ণরূপে 'ধর্মীয়করণ' করে। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী ও

কর্মকর্তাদের বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মুসলিম বিশ্বের কাছে এ ধারণা দিয়েছে, স্বাধীনতার পর দেশটি হবে কমিউনিস্ট ও ধর্মহীন একটি রাষ্ট্র। আর দেশটি হবে হিন্দুশাসিত ভারতের মিত্র রাষ্ট্র, যা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তান পশ্চিমা প্রভাবিত আরব স্বার্থবিরোধী বাগদাদ প্যাক্ট, সিয়াটো, সেন্টো, আরসিডির সদস্য হয়। যে কারণে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের বিরাগভাজন হয় এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া বাদে মুসলিম দেশগুলো নিরপেক্ষ থাকে। মুসলিম বিশ্বের এই ভূমিকার কারণে যুদ্ধের পর পাকিস্তান তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ তাকে সে সুযোগ এনে দেয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের কাছাকাছি আসে এবং পশ্চিমা জোটে থেকেও আরব স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। সৌদি আরব, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরাক, ইরানসহ কয়েকটি আরব দেশের সৈন্যদের ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব পায় পাকিস্তান। এ সময় থেকে আরব বিশ্বের সদস্য না হয়েও পাকিস্তান আরব বিশ্বের মুখপাত্রে পরিণত হয় এবং ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের ৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের অন্যতম সংগঠক পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ওআইসির প্রধান দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, ওআইসির পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের প্রধান কারণ হিসেবে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি ইসরাইলের সমর্থনকে দায়ী করেন। মূলত ওআইসি গঠিত হয়েছিল ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে ইসরাইল এতে সমর্থন দেয়। ২ জুলাই ইসরাইলি সংসদ বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি সামরিক চক্রের 'পাশবিক ও বেপরোয়া ধ্বংসলীলা'কে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাস করে। এছাড়া বাঙালি জাতির প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।[১] করাচি থেকে প্রকাশিত পাকিস্তানের *ডেইলি ডন* (*Daily Dawn*) একাত্তরের ২২ জুলাই প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স নিউজে 'Isreil's full backing for 'Bangladesh' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ইসরাইলি পার্লামেন্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে পাকিস্তানের জনগণকে রক্ষা ও শরণার্থীদের সহায়তার আহ্বান জানানো হয়। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য ইসরাইলি রেডক্রসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওষুধ, খাদ্য, কাপড় পাঠানোর ঘোষণাও দেয়। যদিও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাহায্য সহানুভূতি প্রত্যাখ্যান করে।[২] এ সিদ্ধান্ত প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয়। আরব বিশ্ব যেখানে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়েছে, তখন বাংলাদেশের পক্ষে ইসরাইলি সহযোগিতা গ্রহণ খুবই

স্বাভাবিক ছিল। বাংলাদেশ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরাইলি যোগাযোগের অপপ্রচার থেমে থাকেনি। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার মাহমুদ কাশেম নামে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের এক দূতের জেরুজালেম উপস্থিতি এবং ইসরাইল সরকার কর্তৃক গোলাবারুদ, মেশিনগান, বিমান বিধ্বংসী কামান, ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র সহায়তার[৩] গুজব ছড়ায়। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানপন্থি দল জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* ২ আগস্ট একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃতপক্ষে ভারত-ইসরাইলের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। উল্লিখিত কারণে ওআইসি প্রথম থেকেই পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সংহতিকে প্রাধান্য দেয়।

২. ওআইসি গঠন ও ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত ওআইসিতে পাকিস্তানের ভূমিকা

পাকিস্তান দু'ভাবে ইসলামি ঐক্যের পক্ষে কাজ করে। নিজস্ব উদ্যোগ এবং সৌদি উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতা করে। পাকিস্তান মূলত ভারতকেন্দ্রিক নিরাপত্তা সমস্যার কারণে পশ্চিমা জোটের সদস্য হওয়া ছাড়াও মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যকে প্রাধান্য দেয়। এর মাধ্যমে সে ধনী আরব রাষ্ট্রের সহযোগিতা এবং সঙ্কটকালে তাদের সমর্থন প্রাপ্তির চেষ্টা চালায়। ইসলামি বিশ্বের ঐক্যের স্বার্থে পাকিস্তান সৃষ্টির দুই বছরের মধ্যে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে World Islamic Congress গঠিত হয়। করাচিতে কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে ১৯টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। ১৯৫১ সালের ৯-১১ ফেব্রুয়ারি করাচিতে কংগ্রেসের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তান একটি পৃথক ভাবমূর্তি তৈরি করে। এ সময় বাদশাহ ফয়সাল মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের Pan-Arabism-এর বিপরীতে Pan-Islamism আদর্শ প্রচার করলে পাকিস্তান একে স্বাগত জানায়। ১৯৬২ সালে সৌদি উদ্যোগে মক্কায় একটি ইসলামিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনেই গঠিত হয় রাবেতা আল আলম ইসলামী। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের পরই সৌদি বাদশাহ ফয়সলের বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের জন্য ইরান (১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর), জর্ডান (১৯৬৬ সালের জানুয়ারি), সুদান (১৯৬৬ সালের মার্চ), পাকিস্তান (১৯৬৬ সালের এপ্রিল), তুরস্ক (১৯৬৬ সালের আগস্ট), মরক্কো, গায়েনা, মালি, তিউনিশিয়া (১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর) সফর করেন।[৪] নাসেরের মতবাদ আরব বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় সৌদি বাদশাহর পরিকল্পনা নিয়ে এসব দেশের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। যদিও পাকিস্তান আরব রাষ্ট্র না হওয়ায় এবং পশ্চিমা জোটের সদস্য হওয়ায় নাসেরের পশ্চিমাবিরোধী তৎপরতায় পাকিস্তানের আগ্রহ ছিল না। সৌদি আরবের পরিকল্পনাকে সমর্থন দেয়ার পেছনে পাকিস্তানের অন্য কারণ ছিল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সৌদি আরবের অকুণ্ঠ সমর্থন। যুদ্ধের কয়েক

মাস পর ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সৌদি বাদশাহর পাকিস্তান সফরও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাদশাহর সফরকালে রেডিও মক্কায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল আইয়ুবের 'পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বকে এক মঞ্চে দেখতে চায়'[৫] বক্তব্য সৌদি উদ্যোগের প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়।

অবশ্য ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এবং আরবদের পরাজয় সৌদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ এনে দেয়। বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে প্রায় সব মুসলিম দেশ মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২৬ আগস্ট কায়রোতে আরব লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জরুরি বৈঠকে একটি ইসলামিক সংস্থা গঠনের ঐকমত্যে পৌঁছে এবং এ বিষয়ে মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৩১ আগস্ট সৌদি বাদশাহ ও মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ লারাকির মধ্যে বৈঠকে একটি ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মরক্কোর দূত তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ইরান সফর করেন এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

এভাবে বৃহত্তর মুসলিম সংহতির লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, আরব জাতীয়তাবাদ, প্যান ইসলামিক মতবাদ ও ধর্মভিত্তিক দেশগুলোর সমন্বয়ে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। বিচিত্র রাষ্ট্র কাঠামোর সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে রাজতন্ত্র, সামরিক/আধা-সামরিক, আধা-গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক সরকারের অস্তিত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৬৯ সাল থেকে আইয়ুববিরোধী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চলছিল, তার প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতিতে কিছু গৌরব বয়ে আনা জেনারেল আইয়ুব খান সরকারের জন্য জরুরি ছিল। একই ধারার উত্তরাধিকারী হন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরানোর জন্য আরব বিশ্বের সহযোগিতার জন্য ওআইসিতে পাকিস্তান ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। চীনের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক স্থাপনের সেতুবন্ধন রচনাকারী জেনারেল ইয়াহিয়ার মতো একজন নেতাকেও ওআইসির স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। তাই ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর রাবাতে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম সম্মেলনের প্রাক্কালে ৮-৯ সেপ্টেম্বর প্রস্তুতি কমিটির সভায় ৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬] ২২-২৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলনে ৩৫টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ২৫টি দেশ এতে অংশ নেয়।[৭] জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও সম্মেলনের আগেই পাকিস্তান জানিয়ে দেয় যে, ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হলে যতক্ষণ ভারতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন কক্ষে থাকবেন ততক্ষণ পাকিস্তানের প্রতিনিধি সম্মেলন বয়কট করবে। অবশ্য ভারত সংস্থার খসড়া সনদ অনুযায়ী সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ, সনদে বলা হয়, ৪ ধরনের রাষ্ট্র ওআইসির সদস্য হতে পারবে। ১. যেসব দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান ও রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান, ২. জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান অমুসলিম; ৩. যেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান কিন্তু জনসংখ্যার বড় অংশ অমুসলমান; ৪. যেসব

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান অর্ধেক অমুসলমান।[৮] এই শর্ত অনুযায়ী ভারত সদস্য হতে না পারলেও পর্যবেক্ষক হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। কারণ ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস। ভারত প্রথম থেকেই ওআইসির সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ভারতের শিল্পমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদ ওআইসির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। ভারতের পক্ষে মিসর ও মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে ভারতের অংশগ্রহণ অনুমোদিত হয় এবং সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৩ সেপ্টেম্বর ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে শর্ত জুড়ে দেয়া হয় অবশ্যই একজন মুসলমানকে এতে অংশ নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে শিল্পমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদের নাম সংস্থা প্রস্তাব করে। তাঁর রাবাতে পৌঁছার আগে পর্যন্ত অস্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে রাবাতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত গুর্বাচন সিংহ তাঁর দেশের নেতৃত্ব দেন।[৯] এ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বাদশাহ ফয়সলের অনুরোধে জেনারেল ইয়াহিয়া ভারতের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে রাজি হলেও ভারতের একজন অমুসলমান প্রতিনিধিকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণে তিনি অস্বীকার করেন।[১০] তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তবে একই যোগ্যতাবলে কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, আলবেনিয়া কিংবা ইসরাইলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।[১১] অথচ এসব দেশ সম্মেলনে অংশ নিতে আগ্রহই প্রকাশ করেনি। পাকিস্তানের এসব দেশের, বিশেষ করে ইসরাইলের পক্ষে মত দেয়া ছিল সংস্থার স্বার্থবিরোধী। অথচ সম্মেলনের পুরো সময় পাকিস্তানের কট্টর ভারতবিরোধী মনোভাবের ফলে সম্মেলনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে পাকিস্তান সম্মেলনকে ভারতবিরোধী প্লাটফর্মে পরিণত করার প্রয়াস পায়। এক পর্যায়ে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলিম হত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান অধিবেশন বর্জন করে। জর্ডানের বাদশাহ, ইরানের শাহ ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেন। ইরানের শাহ সম্মেলনের সভাপতি মরক্কোর বাদশাহ হাসানকে জানিয়ে দেন, ভারতের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিলে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনিও সম্মেলন বর্জন করবেন। পাকিস্তান ও তাঁর কট্টরপন্থি মিত্রদের তৎপরতা সত্ত্বেও আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, সুদান, লিবিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন ভারতের পক্ষে মত দেয়। ফখরুদ্দিন আলী আহমদের উপস্থিতির পরও পাকিস্তান তার মনোভাবে অটল থাকে এবং স্বয়ং সৌদি বাদশাহর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানের সম্মেলন বর্জনের কারণে ২৪ সেপ্টেম্বর সকালের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। সংস্থার ভাঙন রোধ ও অচলাবস্থা নিরসনের জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমানের মধ্যস্থতায় ভারতীয় প্রতিনিধি স্বেচ্ছায় অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায় ২৪ সেপ্টেম্বর বৈকালিক অধিবেশনে ইয়াহিয়া খান যোগ দিলে সম্মেলনের কাজ পুনরায় চালু হয়। যদিও ২৫ সেপ্টেম্বর ১ দিন সম্মেলনের

সময়সীমা বাড়ানো হয়। এরপর সম্মেলনে পাকিস্তানের মতামত গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয় এবং পাকিস্তানের আগ্রহের কারণেই ভারতের আহমেদাবাদে দাঙ্গায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং ঘটনার নিন্দা জানানো হয়।[১২] ইয়াহিয়া তার বক্তৃতায় অধিকৃত আরব এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, জেরুজালেমকে ইহুদি কবল থেকে পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন যা মুসলিম বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করে। আরব বিশ্বের সদস্য না হয়েও পাকিস্তান আরব বিশ্বের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের এই গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭০ সালে সংস্থার দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭০ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. আবদুল মালিক মুত্তালিব।[১৩] তিনি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আরব বিশ্বের সংহতি ও ইসরাইলের হাত থেকে আরব ভূখণ্ড মুক্ত করার আহ্বান জানান।[১৪]

৩. মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থা

করাচি সম্মেলনের মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ওআইসিতে পাকিস্তানের গুরুত্ব ও পাকিস্তান কর্তৃক পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতার সঙ্গে সংস্থা দ্বিমত পোষণ করেনি। প্রথম থেকেই পাকিস্তান ওআইসির সদস্যদের সমর্থনের জন্য মুক্তিযুদ্ধকে পরিকল্পিতভাবে ভারত ও ইসরাইলের প্ররোচনায় 'মুসলিম সংহতি' বিনষ্টের প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করে। বিচিত্র রাষ্ট্রকাঠামোর ওআইসির সদস্য দেশগুলো পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় ঐকমত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। মূলত নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার ভাঙন রোধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন তাদের সন্দিহান করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে ২৯ মার্চ সংস্থার মহাসচিব টেংকু আবদুর রহমান এক বিবৃতিতে 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে' পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ সমস্যা' বলে মন্তব্য করেন। ভারতকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আমি মনে করি বাইরের কোনো দেশের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।[১৫] এই বিবৃতির পরপর ৩০ মার্চ ওআইসির সদস্য ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ৩ এপ্রিল তুরস্ক ও মালয়েশিয়া, ৭ এপ্রিল লিবিয়া, ১২ এপ্রিল ইয়েমেন এবং ২৮ এপ্রিল সৌদি আরব অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে।

যদিও পাকিস্তান সরকারের ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানানো হয়, সরকারি ও বেসরকারি বার্তায় সৌদি আরব, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মরক্কো, তুরস্ক পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। মর্নিং নিউজ ১৯ এপ্রিল 'Pak struggle to resist outside interference Widespread support in Muslim

World' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পাকিস্তানের জনগণকে বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রভাবিত করতে এ ধরনের অনেক প্রতিবেদন নয় মাস প্রকাশ করে। ২৭ এপ্রিল মনিং নিউজ প্রকাশ করে অনুরূপ একটি প্রতিবেদন। এতে আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, ইয়েমেন সরকারের পাকিস্তানের ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এতে বাইরের কারো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই বলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারি প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

জুনের প্রথম সপ্তাহে ওআইসির মহাসচিব টেংকু আবদুর রহমান ভারত থেকে প্রথম পাকিস্তান সম্পর্কে অফিসিয়াল বিবৃতি দেন, যা ৭ জুন দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশ করে। ইসলামি সংস্কৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা উপলক্ষে কেন ভারতে আসেন, তিনি পরিষ্কার সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের ঘটনা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এতে তাঁর সংগঠন হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। যদিও পাকিস্তানি জনগণের দুঃখ-কষ্টের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল এবং তাদের সাহায্য দেয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন। মহাসচিব অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখ-দুর্দশার কথা না বলে পাকিস্তানের দুর্দশার কথা বলেছেন। ওআইসি যে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ইস্যুটি এড়িয়ে গেছে তা তাঁর বক্তব্যের শেষাংশ থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'সেক্রেটারিয়েটের শৈশব অবস্থার কথা বিচার করে নিজস্ব নয়, এমন কোনো ব্যাপারে জড়িত হওয়া তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। কারণ সদস্য রাষ্ট্রগুলো এটা পছন্দ নাও করতে পারেন।' এতে এটা স্পষ্ট যে, মুসলিম দেশগুলোর পাকিস্তানপন্থি মনোভাবের ধারাতেই ওআইসি পরিচালিত হয়েছে। এতে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়েই জুন মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তান সফর করেন ওআইসির মহাসচিব। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক, যুক্তরাজ্য পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের ঘোষণা করলে পিণ্ডিতে ১৭ জুলাই পৌঁছে তিনি পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের নিন্দা করেন। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের যে মন্তব্য করেন তাতেও তাঁর পক্ষপাতমূলক নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগা মুসলমান জনগণের জন্য মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধভাবে কেমন করে সাহায্য করতে পারে, তা দেখার জন্য তিনি পাকিস্তান এসেছেন। বাঙালির ওপর পাকবাহিনীর গণহত্যা বাঙালিদের যে দুর্ভোগের প্রধান কারণ তা মহাসচিব আমলে আনেননি।

ওআইসির সবচেয়ে বেশি বৈঠক হয় ১৯৭১ সালে। এপ্রিলে ইরানে ইসলামিক সংবাদ সংস্থার বৈঠক, জুনের প্রথম দিকে মরক্কোতে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বৈঠক এবং জুনের শেষ নাগাদ জেদ্দায় ওআইসি সম্মেলনের চার্টারের খসড়া সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বরে কাবুলে তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষের কারণে তা হয়নি। এসব সম্মেলনের মধ্যে ইরান ও মরক্কো সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ইস্যু আলোচনায় না এলেও পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়

এবং বৈঠকে যোগদানকারী সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের তৎপরতার সাফল্য বয়ে আনে জুনের শেষ দিকে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত জেদ্দা সম্মেলনে (২৪-২৬ জুন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়)। এই সম্মেলনে ওআইসির সনদ চূড়ান্ত হয়। সম্মেলনের প্রাক্কালে জুনের শুরুতে মহাসচিব তাঁর ২৯ মার্চে দেয়া বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করেন এবং পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। মুসলিম বিশ্বের কাছে পাকিস্তানি জনগণকে সাহায্যের আবেদন জানান।[১৬] অবশ্য এখানে তিনি পাকিস্তানি জনগণ বলতে পাকিস্তানপন্থি, না বাংলাদেশপন্থিদের বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট ছিল না। তবে ওআইসির কর্মকাণ্ড থেকে মনে হয়, পাকিস্তানের জন্যই সাহায্য চেয়েছেন। অবশ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ওআইসির সদস্যদের উদ্দেশ করে বলেন :

> It is a tragic error on their part to think that Yahya's hordes are waging a war of Islamic rightousness in Bangladesh. Their silence, therefore, endorse colonialism and barbarism. Material support to Islamabad puts them on the side of dictatorship.[১৭]

সম্মেলন চলাকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সংস্থার কাছে প্রেরিত তারবার্তায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের জন্য সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন :

> বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান। ইয়াহিয়া সরকার জনগণের নির্বাচনের রায়কে অগ্রাহ্য করে বিশ্বাসঘাতকের মত অন্যায় যুদ্ধ করেছে বলেই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। তারা দশ লাখের বেশি লোককে হত্যা করেছে। ৬০ লাখের বেশি লোক গৃহহারা হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা মসজিদসমূহ ধ্বংস করেছে, মসজিদের ইমামদের এবং নামাজরত মুসলমানদের গুলী করে হত্যা করেছে। আর তারা এসব করেছে ইসলামের নামেই।[১৮]

এছাড়া সম্মেলন চলাকালে ২৬ জুন নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশের কূটনীতিক কে.এম. শিহাবুদ্দিন জেদ্দা সম্মেলনের সদস্যদের বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানান। বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন :

> The question of living together with Pakistani butchers, who have shed the blood of millions of our innocent people and who have disrupted our economy, does not arise. I emphasize again

that Pakistan is dead and buried under the bodies of martyrs.[১৯]

যদিও বাংলাদেশের এসব উদ্যোগ ও আহ্বান মুসলিম বিশ্বের নেতাদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি সৃষ্টি করেনি। তারা মুসলিম উম্মাহর সংহতি রক্ষায় পাকিস্তানকে বিব্রত না করার নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনের কোনো চেষ্টা না করেই পাকিস্তানের প্রতি একতরফা সমর্থন অব্যাহত রাখে। ২২ জাতির ওআইসি সম্মেলন শেষে ১ জুলাই প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্তক্ষেপের নিন্দা এবং পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান।[২০] অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানকে সহযোগিতার মত ব্যক্ত করে। ইরান সঙ্কটকালে সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। কারণ ইসলামি সংহতি রক্ষার জন্য তা জিহাদের মতো নৈতিক কর্তব্য।[২১]

জেদ্দা সম্মেলনে প্রকারান্তরে ভারতকে হুমকি দেয়া হয়েছে। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলতে ভারতকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে সঙ্কটকালে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহ্বানও ভারতকে ভয় দেখানোর জন্য বলা হয়েছে। ভারত তেল সরবরাহসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে ধনী আরব রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল থাকায় এ হুমকি দেয়া হয়। পাকিস্তানের গণমাধ্যম যুক্ত ইশতেহারকে ভারতের 'কূটনৈতিক পরাজয়' হিসেবে আখ্যা দেয়। পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম ৩ জুলাই 'পাকিস্তানের প্রতি ২২টি মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থন ভারতকে দিশেহারা করেছে' শিরোনামে প্রতিবেদন। অন্যদিকে একে পাকিস্তানের 'কূটনৈতিক বিজয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়— ১. ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে এ ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ভারত একঘরে হয়ে যাবে; ২. ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে; ৩. কোনো কোনো দেশ পাকিস্তানকে সরাসরি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।[২২] এর ফলে পাকিস্তান যে একা নয়, সঙ্কটকালে মুসলিম বিশ্বের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা পায়। ফলে মে মাস পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিক্ষিপ্তভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য বিবৃতি দিলেও ইসলামি সম্মেলনের পর মুসলিম বিশ্ব একযোগে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ার সুযোগ পায়। নেতাদের পাকিস্তান ও পাকিস্তানের নেতাদের মুসলিম বিশ্বে যোগাযোগ বেড়ে যায়। বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হয়েও বাঙালির ওপর গণহত্যা ওআইসির সদস্যদের মধ্যে সাড়া জাগায়নি। বরং এই সম্মেলনে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যাকে আইনসম্মত করা হয়েছে।

এছাড়া জেদ্দা সম্মেলনের পর ওআইসি পাকিস্তান সরকারের শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যে তৎপরতা তাতে সমর্থন দেয়। করাচিতে মহাসচিবের ২১ জুলাই মন্তব্য থেকে এ ব্যাপারে তাঁকে পাকিস্তানের মুখপাত্রের ভূমিকায় দেখা

যায়। তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলোর পাকিস্তানে যেসব শরণার্থী ফিরে এসেছে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা করতে আগ্রহী, আসন্ন কাবুলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়নের কথাও ঘোষণা করেন।[২৩] ইতোমধ্যে তিনি বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের বিশেষ সহকারী ডা. মালিকের সঙ্গেও বৈঠক করেন। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ সমস্যা সমাধান না করে শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার যে প্রচার চালাচ্ছিল মহাসচিব এ ব্যাপারে আগ্রহী হলেও ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের দুঃসহ জীবনযাত্রা তাঁর মধ্যে সহানুভূতি জাগাতে পারেনি।

যদিও সম্মেলনের পরপরই কুয়েত, ইরান, জর্ডানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ওআইসি মহাসচিবের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ২৭ জুলাই এই প্রতিনিধিরা ঢাকা সফর করেন। সফরকালে তারা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন ছাড়াও গভর্নর টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নবাবপুর এবং সদরঘাটও পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদও সফর করেন। যদিও তারা বাঙালি হত্যা বন্ধে কোনো ভূমিকা রাখেননি।

ওআইসির এই মিশনের দু'জন সদস্য কুয়েতের সুলাইমার আবু দাউস ও ইরানের রেজা তাখওয়াইকে ভারত সফরে অনুমতি না দেয়ায় মহাসচিব ৩১ জুলাই এক ঘোষণার দ্বারা তাঁর ভারত সফর বাতিল করেন। মহাসচিব পরিষ্কার জানিয়ে দেন, যেহেতু তিনি সংস্থার মহাসচিব হিসেবে এই সফর করছেন ব্যক্তিগতভাবে কোনো দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, তাই অন্যান্য সদস্য ছাড়া তাঁর সফরের প্রশ্নই ওঠে না।[২৪] ৪ আগস্ট কুয়ালালামপুরে এক বিবৃতিতে ভারতের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য সংস্থার আগ্রহ সত্ত্বেও ভারতের অনুমতির অভাবে তা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ আনেন। তিনি শরণার্থী সমস্যা সমাধানে ভারতের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, পাকিস্তান নয়, ভারতের কারণেই শরণার্থী সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।[২৫] তিনি পাকিস্তানের মতো শরণার্থীদের সংখ্যা ভারতের ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম বলে মন্তব্য করেন। তিনি পরিষ্কার বলেন, ভারতে শরণার্থীদের সংখ্যা ৭.২ মিলিয়ন বললেও প্রকৃতপক্ষে তা ৪ মিলিয়নের বেশি হবে না।[২৬] অবশ্য ভারত সরকার মহাসচিবের বক্তব্য উড়িয়ে দেয় এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, দুটি কারণে ভারত ইসলামি সংস্থার প্রতিনিধিদের গ্রহণ করতে পারে না। ১. ভারতে ৭০ মিলিয়ন মুসলমানের বসবাস হওয়া সত্ত্বেও এ সংস্থা কখনো ভারতের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করেনি; ২. ওআইসি বরাবর সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেছে।[২৭] যদিও ও ভারতের এই মনোভাব সত্ত্বেও মহাসচিব পরের দিনই ব্যক্তিগতভাবে ভারত সফর করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে বৈঠক করেন। এ সময় ভারতের পররাষ্ট্র দফতর জানিয়ে দেয়, মহাসচিবের এই সফর ব্যক্তিগত সফর, সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে নয়। টেংকু আবদুর রহমান নিজেও এ সফরকে 'Non-Political, non-sectarian and non-religeous and guided by

humanitarian principles.'[২৮] বলে অভিহিত করেন। এ পর্যায়ে এসেও মনে হয়, মহাসচিব পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। তিনি পরিষ্কার বলেন, ইন্দিরা গান্ধী মুজিবের মুক্তি ও পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার আহ্বান জানান। টেংকু বলেন, তিনি এ বিষয় সম্পৃক্ত হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের চেয়ে তখন পাকিস্তানের বিবেচনায় শরণার্থীদের দেশে ফিরে এলে এ সমস্যা সমাধান হবে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করেন। এ ব্যাপারে কুয়ালালামপুরে তিনি সাংবাদিকদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'The only solution was to allow the displaced person to return to East Pakistan but this looked imposible because of the Indian attitude.'[২৯] তিনি কয়েকবার শরণার্থী সমস্যা সমাধানে সহায়তা না করার জন্য ভারতকে দায়ী করেন।

এরপর ইসলামি সম্মেলন সংস্থা পাকিস্তান ইস্যুতে সাংগঠনিকভাবে আর তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। একাত্তরের সেপ্টেম্বরে কাবুলে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসির তৃতীয় সম্মেলনে হয়তো এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা হতো। কিন্তু কাবুল সরকার ৬ আগস্ট সংস্থাকে জানিয়ে দেয়, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে তারা সম্মেলনের আয়োজন করতে পারবে না। এরপরই মহাসচিব কাবুল সম্মেলন স্থগিত করেন এবং জেদ্দায় ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত এই সম্মেলনের দিন নির্ধারিত হয়। ওআইসি এরপর পাকিস্তান ইস্যুতে না জড়ালেও ওআইসি সংগঠনের অন্যতম পাকিস্তানের অন্ধ সমর্থক সৌদি আরব, জর্ডান, ইরান, তুরস্ক, লিবিয়া পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি অংশ নেয়। মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলে অক্টোবর থেকে নিক্সন প্রশাসন গোপনে এসব দেশের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে।[৩০] ইরান ৫২টি মার্কিন ফ্যান্টম বিমান, লিবিয়া জেট বিমান[৩১], সৌদি আরব ৭৫টি জঙ্গি বোমারু বিমান[৩২], জর্ডান ১০টি এফ-১০৪ বিমান[৩৩] সরবরাহ করে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র রবার্ট মেকলসকি এর সত্যতা স্বীকার করেন।[৩৪]

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে অজ্ঞতা, আরব বিশ্বের বিশেষ করে সৌদি আরব, জর্ডান, লিবিয়া, ইরানের সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনে পাকিস্তানের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, সংস্থার মুসলিম উম্মাহর সংহতির ধারণা একাত্তরে পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। পৃথকভাবে কয়েকটি দেশ, যেমন—ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সামান্য সহানুভূতিশীল হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের নীতি ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকাঠামো রাজতন্ত্র, স্বৈরাচারী ও সামরিক শাসন প্রভাবিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের মতো স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে জড়িয়ে নিজেদের দেশে জাতীয়তাবাদী, স্বৈরশাসন/সামরিক

শাসনবিরোধী তৎপরতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজি হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের মতো পৃথিবী আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনায় জাতিসংঘের বিতর্কে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও একপেশে ভূমিকা বাঙালি জাতির কাছে কাম্য ছিল না। ভারতীয় দূতাবাস, মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিফলন ঘটে ওআইসিতে। ওআইসির প্রধান উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর ফলে সৌদি আরবের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল[৩৪] দেশগুলোর অনেকগুলো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও প্রকাশ্যে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

অথচ ওআইসির নিরপেক্ষ ভূমিকা পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যাকে বহুলাংশে কমিয়ে আনতে পারতো। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্বের গালভরা স্লোগান দিলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, মসজিদ ধ্বংস ওআইসির মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। বরং ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থগিত তৃতীয় ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ১৯৭২ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নগ্নভাবে ওআইসির এসব ভূমিকা বাঙালিকে ওআইসি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণে বাধ্য করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়া পর্যন্ত ওআইসি বাংলাদেশের প্রতি এই মনোভাব অব্যাহত রাখে।

তথ্যসূত্র

১. *Asian Recorder* (New Delhi), Vol.XVII, No.38, 1971, p.10370
২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান', *মাসিক অগ্রপথিক*, আগস্ট ১৯৯৭, পৃ.৩৮
৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
৪. Noor Ahmad Baba, *Organization of Islamic Conference Theory and Practice of Pan-Islamic Cooperation*, Dhaka UPL, 1974, p.49
৫. *Islamic Review*, April 1966, p.4, 'Preparatory meeting for Islamic Summit Today', *Dawn* (Karachi), 8 September, 1969
৬. অন্যান্য সদস্য হচ্ছে— মরক্কো, সৌদি আরব, সোমালিয়া, নাইজার, মালয়েশিয়া, ইরান। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য— 'Preparatory meeting for Islamic Summit Today', পূর্বোক্ত
৭. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হচ্ছে— ১. আলজেরিয়া ২. আফগানিস্তান ৩. ইরান ৪. কুয়েত ৫. ইন্দোনেশিয়া ৬. গোয়েনো ৭. চাঁদ ৮. জর্ডান ৯. তুরস্ক ১০. নাইজেরিয়া ১১. দক্ষিণ ইয়েমেন ১২. উত্তর ইয়েমেন ১৩. তিউনিশিয়া ১৪. মালয়েশিয়া ১৫. মালি ১৬. মৌরিতানিয়া ১৭. মরক্কো ১৮. পাকিস্তান ১৯. লেবানন ২০. লিবিয়া ২১. সৌদি আরব ২২. সোমালিয়া ২৩. সেনেগাল ২৪. সুদান ও ২৫. সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র
৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
৯. *Daily Telegraph*, 24 September 1969

১০. *The Dawn*, 25 September 1969; আরো দ্রষ্টব্য : *Pakistan Horizon*, Vol. XXII, No.4, pp. ৩৫৬-৩৫৭
১১. *Pakistan Times*, 25 September 1969
১২. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
১৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত ডা. মালিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক সহকারী ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর দালালির জন্য তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।
১৪. Noor Ahmad Baba, *op.cit.*, p.77
১৫. *Pakistan Horizon*, Cronological, Vol. XXIV, No.2, 1971, pp.136-37
১৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জুন ১৯৭১
১৭. *Asian Recorder*, Vol.XXII, No.32, 6-12 August 1971, p.10300
১৮. *জয় বাংলা* (মুজিবনগর), ২ জুলাই ১৯৭১
১৯. *Asian Recorder, op.cit.*, p.10298; আরো দ্রষ্টব্য-*Hindustan Standard*, 27 June 1971
২০. *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No.3, 1971, p.76
২১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৭
২২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ জুলাই ১৯৭১
২৩. *The Dawn*, 22 July 1971
২৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ আগস্ট ১৯৭১
২৫. *Pakistan Horizon*, *op.cit.*, p.86
২৬. *The Hindustan Times*, 5 August 1971
২৭. *Ibid*
২৮. *The Dawn*, 8 August 1971
২৯. *Ibid*
৩০. *Financial Times* (London), 16 October 1971
৩১. *দৈনিক আজাদ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১
৩২. *Financial Times*, op.cit.
৩৩. Iftekhar A. Chowdhury, *Bangladesh External Relations the Strategy of Small Power in a Sub-system* (unpublished Ph.d. Thesis), Australia: National University, 1988, p. 127-28 আরো দ্রষ্টব্য
V.B. Kulkarni, *Pakistan : Its Origin and Relations with India*, Dhaka, 1988, p. 118. অবশ্য ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন প্রথম এসব দেশের মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের তথ্যটি ফাঁস করেন। দ্রষ্টব্য- *Pakistan Horizon*, Vol.XXV, No.1, 1992, p. 177
৩৪. সৌদি আরব, লিবিয়ার ওপর পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলো আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকায় তারা স্বাধীন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান বাংলাদেশের প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল হলেও সোচ্চার হয়নি। স্বাধীনতার পর এসব দেশের বাংলাদেশকে বিলম্বে স্বীকৃতি দেয়ার পেছনেও একই কারণ ছিল।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

ইন্দোনেশিয়া

অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণ এবং কোনো কোনো রাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করলেও পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র ভারসাম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে। প্রথমদিকে বাংলাদেশ ইস্যুতে অপর্যাপ্ত তথ্য, ওআইসিসহ মুসলিম দেশের পাকিস্তানের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে ইন্দোনেশিয়া সরকারও সেই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদম মালিক বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের 'পূর্ব পাকিস্তান নীতিকে' সমর্থন করেন। ইস্যুটি পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' এবং 'পাকিস্তান অখণ্ডতা রক্ষায়' তিনি বক্তব্য দিলেও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ১৯৭১ সালের মে মাসের আগে পাকিস্তান ইস্যুতে কোনো মন্তব্য করেন নি। তবে ১৯৭১ সালের জুন মাসের আগে পর্যন্ত জাকার্তার সরকারি নীতিতে পাকিস্তানপন্থি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও অধিকাংশ মুসলিম দেশকে অনুসরণ করে পাকিস্তানকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকে। সমস্যা সমাধানের পরামর্শ ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া ও ভারত পাকিস্তানকে যুদ্ধ বন্ধে বারবার মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। একই সাথে জাতিসংঘে উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। সরকারি নীতির বিপরীতে ইন্দোনেশিয়ার বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা ছিল অনেকাংশে বাংলাদেশপন্থি। পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের প্রতিবাদ ছাড়াও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বার্থে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে তারা মতামত দেন। ইন্দোনেশিয়ার রেডিও এবং টেলিভিশনে যে সংবাদ পরিবেশিত হতো, তাতে সরকারের ইচ্ছার বাইরে হলেও বাংলাদেশের প্রতি কখনও কখনও সহানুভূতি প্রকাশ পেতো। অবশ্য

জাকার্তার প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'আমরা' (Amora group) ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে ইন্দোনেশিয়া সরকার অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো পাকিস্তানের সংহতির শেষ চেষ্টা না করে বাস্তবতা উপলব্ধি করে যুদ্ধ বন্ধ করাকে প্রাধান্য দেয়। স্বয়ং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধরত পাকিস্তান ও ভারতকে যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব ছাড়াও তাঁর সরকার জাতিসংঘে এ বিষয়ে অবদান রাখে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ইন্দোনেশিয়া তার জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে স্বতন্ত্র ধারায় মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত দুটি দিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। **প্রথমত,** ইন্দোনেশিয়া কেন অন্যান্য মুসলিম দেশের নীতির বাইরে স্বতন্ত্র ও ভারসাম্যমূলক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে তা নির্ণয় করা হবে। **দ্বিতীয়ত,** নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে জাকার্তা সরকার, গণমাধ্যম ও জনমতের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে। অবশ্য তিন পর্যায়ে এ ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে। প্রথম পর্যায় মার্চ-জুলাই মাস, দ্বিতীয় পর্যায় আগস্ট-অক্টোবর মাস এবং তৃতীয় পর্যায় ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার নীতি আলোচনা করা হবে।

২. ইন্দোনেশিয়ার ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণের কারণ

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাই প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সমস্যাকে অন্যান্য দেশের মতো ইন্দোনেশিয়া সরকার পাকিস্তান সঙ্কট, কখনো পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট, কিংবা পাক-ভারত সংঘাত হিসেবে দেখেছে। ইন্দোনেশিয়ার গণমাধ্যম ও জনমত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য দিলেও শেষ পর্যন্ত সরকারি নীতিতে মুক্তিযুদ্ধ কখনও প্রাধান্য পায়নি। অবশ্য ইন্দোনেশিয়া নিজের ভৌগোলিক অবস্থান, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, তৎকালীন পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ও তাদের রাজনীতি সব মিলিয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে ভারসাম্যমূলক নীতিকেই প্রাধান্য দেয়। এর বেশ কয়েকটি কারণও ছিল।

প্রথমত, ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর পঞ্চম, এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পূর্বে সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমাংশ শেষ হয়েছে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে।[১] অতএব, দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে ইন্দোনেশিয়া উপমহাদেশের অন্যতম নিকটতম দেশ। ভারত উপমহাদেশ ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বেশি সচেতন ছিল। কিন্তু উপমহাদেশের দুটি দেশ পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো ৮৭% মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের মুক্তিসংগ্রাম এসব

বিবেচনায় ইন্দোনেশিয়া অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো কট্টর পাকিস্তানপন্থি হতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, এরপরও ইন্দোনেশিয়ার নীতিতে প্রথম দিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এর জন্য ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বহিঃস্থ কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ১৯৬৫ সালে সুহার্তো ক্ষমতায় এসে দেশ থেকে গণতন্ত্রের বদলে সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। দেশে সীমিত গণতন্ত্র বজায় রেখে সামরিকীকরণ ঘটানো হয়। মোট ৪৬০ পার্লামেন্টের সদস্যের জন্য ১০০ সদ্য প্রেসিডেন্ট সুহার্তো কর্তৃক মনোনীত। ১৯৫৫ সালের পর দীর্ঘ ১৬ বছর পরে নির্বাচন হয়। এই পরিস্থিতিতে শ্রেণিগত মিলের কারণে ইন্দোনেশিয়া সরকার পাকিস্তানের মতো একটি সামরিক শাসকের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করবে না এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার জাতিগত সঙ্কটও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ৩০০টি জাতিগত গোষ্ঠী এবং ২৫০টি ভাষা ও ১৩৬৭৭টি দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া।[২] নানা গোষ্ঠী, ভাষাভাষী সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কারণে ইন্দোনেশিয়ায় প্রবল জাতিগত সঙ্কট রয়েছে। এছাড়া পশ্চিম ইরিয়ান দ্বীপ, পূর্ব তিমুর নিয়ে রয়েছে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এবং বৃহৎ শক্তির রাজনীতি। নিজের দেশের এমনি জাতিগত বহুধা সমস্যার মধ্যে অন্য একটি দেশের জাতিগত সঙ্কটে ইন্দোনেশিয়া জড়াতে চায়নি। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়ে নিজের দেশের জাতীয়তাবাদীদের প্রশ্রয় দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ প্রথম থেকেই মুসলিম বিশ্বের কাছে রুশ-ভারতের ইসলামি সংহতি বিনষ্টের প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ইসরাইলের সমর্থন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য সাহায্য ঘোষণা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যাখ্যান করলেও মুক্তিযুদ্ধে ইসরাইলের সহযোগিতার খবর *দৈনিক সংগ্রাম, পাকিস্তান টাইমস, ডনসহ* পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করে। দেশি-বিদেশি প্রচারণার কারণে মুসলিম বিশ্বের শত্রু রাষ্ট্র ইসরাইলের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার বিষয়টি প্রচার পাওয়ায় মুসলিম বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রথম থেকে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। এছাড়াও ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এর সক্রিয় সদস্য ইন্দোনেশিয়া প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রাখেনি।

চতুর্থত, তৎকালীন পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতীয় স্বার্থের কারণে পাকিস্তানের দিকেও ইন্দোনেশিয়া ঝুঁকে পড়ে নি। পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক ১৯৭১ সালের আগে কখনোই মধুর ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার ১৯৫৪ সালে মার্কিন ও ব্রিটিশ উদ্যোগে গঠিত সিয়াটো চুক্তি প্রত্যাখ্যান, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর

নিন্দা, পরের বছর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বান্দুং সম্মেলন ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্বদান মার্কিন সরকার সহজভাবে দেখেনি। এ সময় থেকেই ইন্দোনেশিয়া মার্কিন সিআইএর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ আনে। ১৯৬০-এর দশকে কেনেডি ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন ভ্রান্তনীতি পরিহার করে বাস্তবনীতি গ্রহণের কথা বললেও ১৯৬৩ সালে মালয়েশিয়া গঠনে মার্কিন সহযোগিতাকে ইন্দোনেশিয়া সাম্রাজ্যবাদী আক্রান্ত হিসেবে অভিহিত করে। তখন থেকে ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন বিরোধিতা প্রবল রূপ নেয়। জনগণের সাথে সাথে সরকারও এতে যোগ দেয়। মার্কিন ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র বন্ধ ছাড়াও মার্কিন বিনিয়োগকৃত তেলক্ষেত্রগুলো আক্রান্ত হয়। অবশ্য প্রেসিডেন্ট জনসনের সময় স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করা হলেও তা বিশেষ সফল হয়নি। নিক্সন ক্ষমতায় এসেই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালে জাকার্তা সফর করেন। কিন্তু এই সফর যে ব্যর্থ হয় তা সিনেটের পররাষ্ট্র কমিটির রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়। এতে নিক্সনের সফরকে 'very damaging consequencies for both the Shuharto government and also for Indonesian-American relations'[৩] হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৭১ সালের আগস্টে ইন্দোনেশিয়ার পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ১০% ট্যাক্স আরোপ এবং অক্টোবর মাসে সিনেট নিক্সনের বৈদেশিক সাহায্য বিল বাতিল করলে ইন্দোনেশিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার রুপি ১০% অবমূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে সাময়িক সময়ের জন্য ইন্দোনেশিয়া আর্থিক সঙ্কটে পতিত হয়। এর সাথে যুক্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের নতুন সম্পর্কের হুমকি। আগস্ট মাসে কিসিঞ্জারের পাকিস্তান হয়ে চীন সফর এবং চীন-মার্কিন আঁতাতে ইন্দোনেশিয়া শঙ্কিত হয়।

পরাশক্তির মধ্যে কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম দিকে সম্পর্ক ভালো ছিল। বান্দুং সম্মেলনকে কেন্দ্র করে চীন-ইন্দোনেশিয়া যোগাযোগ গড়ে উঠলেও ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে ইন্দোনেশিয়ায় ৩০৫ মিলিয়ন চৈনিক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অবস্থান, এদের ইন্দোনেশীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব এবং সর্বোপরি এদের প্রতি চীনের দ্বিমুখী নীতির কারণে কখনো চীন-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়নি। চৈনিকদের আগমন রোধে ১৯৫০ সালে ইন্দোনেশিয়া আইন পাস করলেও চৈনিকদের আগমন থেমে থাকে নি। বরং ১৯৭০-এর দশকে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়ন।[৫] ১৯৬০-এর দশকে ইন্দোনেশিয়া-চীন সম্পর্ক ছিল উষ্ণ। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬৭ সালে চীনবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীরা চৈনিক দূতাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং দাবির মুখে ইন্দোনেশিয়া সরকার ১৯৬৭ সালের এপ্রিলে চৈনিক চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার ও কাউন্সিল জেনারেলকে বহিষ্কার করে। এ সময় চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করারও দাবি ওঠে। এর ফলে ইন্দোনেশিয়ায় চৈনিক জনগোষ্ঠী হুমকির

সম্মুখীন হয়। এসব চৈনিকের প্রতি চীনের সমর্থন ইন্দোনেশিয়াকে ভাবিয়ে তোলে। অন্যদিকে চীন-মার্কিন আঁতাত, সিঙ্গাপুরে চৈনিক প্রভাব ইন্দোনেশিয়াকে নিজস্ব নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। তাই ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘে চীনের সদস্যভুক্তির বিরোধিতা ছাড়াও জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। অন্যদিকে আসিয়ানে (Association of South Asian Nations) আরো সক্রিয় হয়।

মার্কিন ও চীনের সঙ্গে বৈরিতার বিপরীতে প্রেসিডেন্ট সুকর্নের সময় থেকে সোভিয়েতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মার্কিন বৈরী নীতির কারণে সুকর্ন সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং সোভিয়েত সামরিক সহযোগিতা নেন। ইরিয়ান সমস্যায় মার্কিন সরকার ইন্দোনেশিয়ার স্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন দেয়। মালয়েশিয়াবিরোধী সকল উদ্যোগেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইন্দোনেশিয়ার পাশে দাঁড়ায়। এ সুযোগে সমাজতান্ত্রিক দল পিকেআই সুকর্ন মন্ত্রিসভায় তিন পদ পায়, ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। তবে ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ১৯৬৮ সাল থেকে ভারত মহাসাগরে রুশ নৌবাহিনীর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়া রুশ নীতিতে সংশয় প্রকাশ করে। নিক্সনের কমিউনিস্টবিরোধী ঘোষণার বিপরীতে ১৯৬৯ সালে রাশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়া শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে এ অঞ্চলে পরাশক্তিকে প্রবেশের সুযোগ না দেয়ার অনুরোধ জানায়।[৬] এভাবে রুশ-মার্কিন আধিপত্য থেকে ভারত মহাসাগরে দেশগুলোকে মুক্ত রাখার নেতৃত্ব দেয় ইন্দোনেশিয়া। তবে দ্বিপাক্ষীয়ভাবে ১৯৭০ সাল থেকে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক আবার ঘনিষ্ঠ হয় এবং একই বছর আগস্টে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি পুনর্মূল্যায়নের পর রাশিয়াসহ কমিউনিস্ট ব্লকের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়।[৭] বাণিজ্যিক ও কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে ২২,০০০ কমিউনিস্ট রাজবন্দির মুক্তি[৮] দু'দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ দেয়।

পরাশক্তির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কের এই ধারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তার নীতি গ্রহণের পেছনে কাজ করেছে। প্রেসিডেন্ট সুকর্নের মার্কিন বিরোধিতারবিপরীতে সুহার্তোর মার্কিনপ্রীতি থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দোনেশিয়ার স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে রাজনৈতিক সম্পর্কের বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কই প্রাধান্য পায়। অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার তেলক্ষেত্রগুলোর বড় অংশে মার্কিন বিনিয়োগ রয়েছে। সুহার্তো তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়লেও পশ্চিমা প্রভাবিত কোনো জোটে যোগ দেন নি। সুকর্নের আমলের শেষ দিকে চীনের সঙ্গে মৈত্রী জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও সুহার্তোর ক্ষমতা গ্রহণ, কমিউনিস্ট

বিরোধিতার কারণে তা সফল হয়নি। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্কটকালে সমর্থন দেয়ায় সোভিয়েতের সঙ্গে সুহার্তোর আমলে সম্পর্ক কখনোই বিরোধিতায় রূপ নেয়নি। রাশিয়াসহ সোভিয়েত ব্লকের দেশ যেমন— যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক সকল সময় অব্যাহত ছিল। ১৯৭১ সালে চেকোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদিম মালিকের সফর এ সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করে। এভাবে পরাশক্তির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কও ১৯৭১ সালে উপমহাদেশ নীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে এবং পাক-ভারত সংঘর্ষের সুযোগে যাতে পরাশক্তি ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন করে প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে না পারে, ইন্দোনেশিয়া সেদিকে সতর্ক থাকে।

পঞ্চমত, ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের বিপরীত স্বতন্ত্র নীতিনির্ধারণের আরো একটি কারণ ছিল ধনী আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর তার কম নির্ভরশীলতা। ধনী আরব দেশ, বিশেষ করে সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, আরব আমিরাত, কুয়েতের ওপর তুলনামূলকভাবে আর্থিকভাবে দুর্বল মুসলিম দেশগুলো নির্ভরশীল। তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তারা ধনী দেশগুলোর নীতি অনুসরণ করেছে। অথচ ইন্দোনেশিয়া পঞ্চাশের দশক থেকেই তেল উত্তোলনে সাফল্য লাভ করে। পৃথিবীর মোট তেল রিজার্ভ ও উৎপাদনের ২% ইন্দোনেশিয়া করে থাকে।[৯] ইন্দোনেশিয়ার তেলের উন্নত মান ও সম্ভাবনা বিশ্বে দেশটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। এছাড়া ১৯৬৯ সাল থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরব, লিবিয়া, ইরাক, ইরান, জর্ডান, ওমান, আরব আমিরাত, তুরস্ক, কুয়েতের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির বলে পাকিস্তান এসব দেশে সামরিক পুনর্গঠন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব লাভ করে।[১০] উল্লেখ্য, এসব দেশের অস্ত্রের বড় অংশের জোগানদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদের মধ্যে জর্ডান, তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান মার্কিন জোটের সদস্য। অথচ ইন্দোনেশিয়া কোনোভাবেই সামরিক ও আর্থিকভাবে এসব দেশের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ায় একাত্তরে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে।

ষষ্ঠত, অবশ্য ইন্দোনেশিয়া সরকারের ভারসাম্যমূলক নীতির বিপরীতে ইন্দোনেশিয়াবাসী ও গণমাধ্যম ছিল অনেক অগ্রসর। শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধে এদের সমর্থন ছিল উল্লেখযোগ্য। এর পেছনে অবশ্য কারণও ছিল। ইন্দোনেশিয়া বাঙালিদের মতোই সংগ্রামী জাতি। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালে ডাচদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পাশ্চাত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া শুরু থেকেই পাশ্চাত্যবিরোধী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন দেশে পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব থাকলেও ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসন শুরু হয়। ফলে প্রথম থেকেই ইন্দোনেশিয়ার জনগণ রাজনৈতিক সচেতন ছিল। জনগণের এই সচেতনতার সঙ্গে যোগ হয়েছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি। ১৯৭০ সালের হিসেবে সেখানে শিক্ষিতের হার ৬২%।[১১] স্থানীয় ও ইংরেজি ভাষায়

প্রকাশিত প্রায় শতাধিক পত্রিকা এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। জনসংখ্যার ৮৭% মুসলমান হলেও ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় উদারতা স্বীকৃত হওয়ায় জনগণের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। বিরোধী দল ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের সামরিক বাহিনী প্রভাবিত নির্বাচনে ৯টি বিরোধী দলের ১২৭টি[১২] আসন লাভকে বিরোধী পক্ষ 'গণতন্ত্রের জয়' হিসেবে উল্লেখ করে।[১৩] এর মধ্যে ধর্মভিত্তিক দল ৩৬টি আসন লাভ করে। অথচ ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দল ওলামা পার্টি, মাসজুমী দল মিলে ২৬০টি আসনের মধ্যে ১০২টি আসন লাভ করে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ইন্দোনেশিয়ার ক্রমান্নয়ে উদারপন্থি মানসিকতার জয় হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে শুধু মাসজুমী দলের সঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ দলের কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ বিরোধী দলগুলোর অন্যরা বাংলাদেশের গণহত্যা, শরণার্থী ইস্যুতে সোচ্চার ছিল। প্রথম থেকেই ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রসমাজ বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে রাজপথে নামে, পত্রপত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন দেন। পত্রিকার ইতিবাচক ভূমিকার ফলে দু'একটি পত্রিকা যেগুলো পাকিস্তানের পক্ষে ছিল তারাও পিছুটান দেয়। এমনিভাবে জনমত, গণমাধ্যম ও বিরোধী দলের চাপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ইন্দোনেশিয়া সরকার অখণ্ড পাকিস্তান, পাকিস্তানের সংহতির ধারণা থেকে সরে এসে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয়। যদিও পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের অনীহার কারণে ইন্দোনেশিয়ার উদ্যোগ সফল হয়নি। আর বাংলাদেশও তার স্বাভাবিক পথ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে।

৩. মুক্তিযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার নীতির বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পর্যায় (মার্চ-জুলাই ১৯৭১)

শিক্ষিত, গণসচেতন ও গণতন্ত্রমনা দেশ ইন্দোনেশিয়ার জনগণ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। বিশেষ করে তার নিজ মহাদেশ, নিজ ভূখণ্ডের খুব দূরে নয় এমন একটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম থেকেই ইন্দোনেশিয়ার পত্রিকাগুলো সচেতন ছিল। পত্রিকাগুলো বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়, ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনের সংবাদ গুরুত্বসহ প্রকাশ করে। এতে করে বঙ্গোপসাগরের তীরে একটি দেশ সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়াবাসীর সচেতনতার প্রমাণ মেলে। এমনকি নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, অসহযোগ আন্দোলন পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বসহ ছাপা হয়। তবে সামরিক প্রভাবিত সরকারের বিধিনিষেধ থাকায় পত্রিকাগুলো প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দেয়।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষিত জনগণ, বিশেষ করে ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা পত্রিকার দ্বারা প্রভাবিত হন। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকায় জনগণ ও রাজনীতিবিদরা তাদের প্রতিক্রিয়া বৃহৎ পরিমণ্ডলে না করে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্ত করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর হামলা চালানোর পর ইন্দোনেশিয়াই মুসলিম বিশ্বের প্রথম দেশ, যে সরকারিভাবে পাকিস্তান সঙ্কট সম্পর্কে মন্তব্য করে। ২৭ মার্চ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদম মালিক পাকিস্তানের সমস্যাকে তার 'অভ্যন্তরীণ সঙ্কট' হিসেবে অভিহিত করেন।[১৪] পরের মাসের ৩ তারিখে অপর এক বিবৃতিতে তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কেননা সমস্যাটি শিগগিরই সমাধান হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।[১৫] যদিও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক পাকিস্তান সমস্যার সমাধান না হওয়ায় জাকার্তা সরকার এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করে। এপ্রিল মাস থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পাকিস্তান সংহতি রক্ষাসহ[১৬] পাকিস্তানের সামরিক সরকার গৃহীত সকল ব্যবস্থায় অকুণ্ঠ সমর্থন করলেও ইন্দোনেশিয়া পাক সামরিক চক্রের পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপকে সমর্থন দিয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি।

পাকিস্তান সম্পর্কে প্রাথমিক আবেগ ও সমবেদনা কাটিয়ে এপ্রিল মাস থেকে জাকার্তা সরকার সতর্কতার সাথে মন্তব্য করে এবং বিবৃতি দেয়। এ সুযোগে এপ্রিল মাস থেকেই ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু সাময়িকী, পত্রিকা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সমস্যাকে তুলে ধরে। ১৫ এপ্রিল জনপ্রিয় *জাকার্তা টাইমস, ইন্দোনেশিয়া অবজারভার* বিভিন্ন প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাতে বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, বাঙালি দাবির যৌক্তিকতা ফুটে ওঠে। 'Is Islam Dead?' শিরোনামে জাকার্তা টাইমসের আবেগপ্রবণ নিবন্ধের শেষে মুসলিম বিশ্বের কাছে যে আবেদন জানানো হয় তা হলো : 'Muslim States should act quickly and see that good muslims are not massacared by fellow muslims. The International Islamic Organization should also not be silent spectators in the present situation in East Pakistan but should do whatever is possible within their limited strength to stop the genocide and restore peace in the region.'[১৭] অবশ্য এগুলো রচনা, প্রচারের নেপথ্যে কাজ করেছে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন 'আমরা'। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ইন্দোনেশিয়ায় জনমত সৃষ্টি, গণমাধ্যমে তথ্য সরবরাহ, মুজিব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে এ সংগঠন অসামান্য অবদান রাখে।[১৮]

এসব উদ্যোগের পাশাপাশি এপ্রিল মাসের দুটি ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইন্দোনেশিয়ায় প্রচার পেয়েছিল। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে পাকিস্তান সরকার প্রথম

থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক এ অভিমত প্রকাশ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তিনটি জাপানি জাহাজ ভর্তি চাল অশান্ত পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এলে তা করাচিতে খালাস করতে বলা হলে জাহাজ কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে। অবশ্য পরে তা জাকার্তায় এসে খালাস করে।[১৯] এর মাধ্যমে এতোদিনের পাকিস্তান সরকারের তথ্য-সন্ত্রাস ফাঁস হয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানি বাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ জন ছাত্র জাকার্তায় পাকিস্তানি দূতাবাসে ৭ এপ্রিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সামরিক শাসনাধীনে মিছিল নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটানোর অভিযোগে দু'জন ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। যদিও ছাত্ররা দাবি করে যে, তাদের বিক্ষোভ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় বরং বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি সংহতি ও সমবেদনা প্রকাশ মাত্র।[২০] সরকার তাৎক্ষণিক বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মালিক ছাত্রদের ইন্দোনেশিয়ার আইন স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ জাতীয় বিক্ষোভ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। তিনি কড়া ভাষায় বলেন, পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা পুরোপুরি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে বাইরের কোনো দেশের হস্তক্ষেপের বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার অধিকার নেই। এছাড়া পাকিস্তানে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত ৯ এপ্রিল ইসলামাবাদে এক বিবৃতিতে তার সরকারের পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সঙ্কটে সহানুভূতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।[২১] ছাত্রদের বিক্ষোভ জাকার্তায় সরকারি মহলে ব্যাপক শঙ্কার সৃষ্টি করে। ছাত্রদের বিক্ষোভ যাতে ছাত্র ও অন্যদের মধ্যে প্রসার ঘটতে না পরে এবং তা ইন্দোনেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে চলে না যায় এ ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। ছাত্রদের সতর্ক করা ছাড়াও ১০ এপ্রিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদম মালিক ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এন বি মেননকে তলব করেন। ভারতীয় দূত অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের সমর্থনের বিষয়টি অস্বীকার করেন।[২২]

ইন্দোনেশিয়া সরকারের বিক্ষোভ-পরবর্তী সতর্কতা সত্ত্বেও পত্রিকাগুলোর কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি বাড়তে থাকে। ১৩ এপ্রিল *দৈনিক সিনার হারাপান* (Sinar Harapan) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দু'দিন পর *দৈনিক কম্পাস* (Compas) ইয়াহিয়াকে সহযোগিতার জন্য চীনকে দায়ী করে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। একই দিন *জাকার্তা টাইমস* 'Stop the Genocide' শিরোনামে এক হৃদয়স্পর্শী সম্পাদকীয়তে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বর্বরতা, পাকিস্তানিদের অমানুষিক ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে। এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের হস্তক্ষেপও কামনা করে। অবশ্য পত্রপত্রিকার ইতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া সরকার আগের মনোভাবে

অটল থাকে। ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি এ ব্যাপারে নেতিবাচক বক্তব্য দেন। ২৫ এপ্রিল এ সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁর সরকার পাকিস্তানের বিভক্তির বিপক্ষে।[২৩] এছাড়া ২১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ নাৎসির (Natchir) পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন।[২৪]

অবশ্য এ সময় 'আমরা' সংগঠনের তৎপরতা ও পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মতামত জাকার্তায় পাকিস্তান দূতাবাসকে ভাবিয়ে তোলে। দূতাবাসের পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাঙালিদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। পত্রপত্রিকাগুলোকে প্রভাবিত করা ছাড়াও ১০ মে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জাকার্তার পত্রিকাগুলোর সাংবাদিক, মালিকদের সম্মানে দেওয়া এক নৈশভোজে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের তথ্য প্রকাশ না করার এবং এ ব্যাপারে পাকিস্তানপন্থি লেখালেখির আহ্বান জানান।[২৫] যদিও *International Tribune*[২৬] ছাড়া কোনো পত্রিকায়ই পাকিস্তানের পক্ষে তেমন উদ্যোগী ছিল না, বরং নৈশভোজে যোগদানকারী *ইন্দোনেশিয়া অবজারভারের* সাংবাদিক 'পূর্ব পাকিস্তান' সঙ্কট নিয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদন লেখেন, যা পরের দিনই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। ১১ মে প্রকাশিত পত্রিকার এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফলাও করা হয়।

ক. ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ৪ লাখ বাঙালি নিহত হয়েছে।
খ. অনেক জায়গায় রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
গ. ৫৫% পাটকলে ১৫% শ্রমিকের বেশি কর্মে নিয়োজিত নেই।
ঘ. লাখ লাখ লোক বুভুক্ষু রয়েছে।
ঙ. পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে ইয়াহিয়ার পক্ষে এ বছর টিকে থাকা সম্ভব নয়।
চ. সৈন্যদের দ্বারা দোকানপাট লুট হচ্ছে।
ছ. একজন শীর্ষস্থানীয় পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী মন্তব্য করেছেন, ৬০% পণ্যের এই উপনিবেশটি তাদের হাতছাড়া হয়েছে।

মে মাসে পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সঙ্কটের দুই মাস পর প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন। ২৮ মে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দেয়া তারবার্তায় ভারতের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। পাশাপাশি বার্তায় তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সফল হবেন।[২৭] কয়েক লাইনের এই বার্তায় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন এবং কূটনৈতিকসুলভ বাক্য ব্যবহার করেন। ইয়াহিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের সমর্থন কিংবা আর্থিক বা বস্তুগত কোনো সাহায্যের ইঙ্গিত এই তার বার্তায় ছিল না।

অবশ্য জুন মাসে সাধারণ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ইন্দোনেশিয়ায় কম প্রচারণা পায়। নির্বাচনের পর আবারো পত্রিকাগুলোতে পাকিস্তান সঙ্কট প্রাধান্য পায়। নির্বাচনের ফলাফলে কোনো পরিবর্তন না ঘটায় পাকিস্তান সঙ্কটে ইন্দোনেশিয়ার নীতিরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। পাকিস্তান সরকার ও জাকার্তাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বিরোধিতা সত্ত্বেও এ মাসে ভারতের ভ্রাম্যমাণ দূত প্রবীণ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য জাকার্তা সফর করেন। সরকারি পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রক্ষা করা না হলেও ইন্দোনেশিয়ার পত্রিকায় ভারতীয় নেতার সফর, সাক্ষাৎকার গুরুত্বসহ প্রচার করে। মুক্তিযুদ্ধ ও এতে ভারতীয় নীতি সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার অনেক বিভ্রান্তি তাঁর বক্তব্য থেকে দূর হয় এবং ইন্দোনেশিয়ায় এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সরেজমিনে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেখার জন্য এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার *Pedomen Indonesia*-এর সাংবাদিক আবদুল্লাহ আলামুদি (Alamudi) ইউরোপ ও ভারতে ছয় সপ্তাহ সফর করেন। ভারতের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও কলকাতায় বাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করেন। জুনে দেশে ফিরে ১৩ জুন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠক শেষে তিনি তাঁর সফরের ভিত্তিতে এক প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে তিনি ইন্দোনেশিয়া সরকারের পাকিস্তান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি পত্রপত্রিকা ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এই প্রতিবেদনের উপসংহারে তিনি বলেন, জনগণের বড় অংশই উপলব্ধি করছে পাকিস্তানের সংহতি চিরতরে নষ্ট হয়েছে। আওয়ামী লীগকে দায়ী করে পাকিস্তানি প্রচারণায় তারা বিশ্বাস করছে না।[২৮] তাঁর এই প্রতিবেদন এবং পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন জুন মাসে ইন্দোনেশিয়া সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সামান্য হলেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। এর পরপরই পার্লামেন্টের স্পিকার ও আন্তর্জাতিক ইসলামি সংগঠনের সভাপতি Achmed Sjaicho এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও মাসজুমী দলের শীর্ষ নেতা ড. মোহাম্মদ নাৎসির (Natchir) পাকিস্তান সরকারকে বিজ্ঞচিতভাবে পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান।[২৯]

জুন মাসে সরকারি ও বেসরকারি কিছু ঘটনাবলি থেকে মনে হয় ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুটিতে গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এ মাসে জাতিসংঘের মহাসচিবের শরণার্থীদের সহায়তা দানের আবেদনের আহ্বান ফলাও করে প্রচার ছাড়াও টিভিতে শরণার্থীদের গমন, মানবেতর জীবনযাত্রা প্রচার করে। পাকিস্তানি মিশনের পূর্ব পাকিস্তানির অবস্থা স্বাভাবিক বলে প্রচারণার বিষয় ইন্দোনেশিয়ায় ক্রমান্বয়ে অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। জাতিসংঘের মহাসচিবের আহ্বানের পরপর ৯ জুন আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থার মহাসচিব এইচ এইচ মার্জুকি জাতিম ইন্দোনেশিয়া সরকারকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ওষুধ ও অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। এছাড়া তিনি বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শরণার্থীদের জন্য

বস্তুগত সাহায্যের আবেদন জানান।[৩০] মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দিল্লিস্থ ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহের মস্কো, জার্মানি ও প্যারিস সফরে স্থানীয় ভাষা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো প্রচার করে। ২৪-২৬ জুন জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি যোগ দেয়। সম্মেলন শেষে ১ জুলাই প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নিন্দা ও পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানো হয়।[৩১] যুক্ত ঘোষণার বাইরে লিবিয়া, ইরানের প্রতিনিধিরা সঙ্কটকালে সরাসরি পাকিস্তানে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও ইন্দোনেশিয়া উস্কানিমূলক কোনো মন্তব্য করেনি।

জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশ ইস্যুতে একটি অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ইন্দোনেশিয়া সরকার পত্রিকাগুলো থেকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবর পরিবেশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এ মাসেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের একটি সাক্ষাৎকার ইন্দোনেশিয়ার টেলিভিশন প্রচার করে। সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তাানি বাহিনীর গণহত্যা, বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। মোশতাক পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার বিষয় পরিষ্কার করেন, 'There is always room for negotiation but independence of Bangladesh could not be bartered away for the sake of negotiated settlement.'[৩২] এই সাক্ষাৎকার পত্র পত্রিকায় গুরুত্বসহ ছাপা হয় এবং এর পরপরই ইন্দোনেশিয়ার জনমত বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। পত্রিকাগুলো রাজনৈতিক সমাধান একমাত্র বাংলাদেশ সঙ্কট সমাধানের উপায় তা বুঝতে সক্ষম হয়। জুন মাসের শেষদিকে পত্রপত্রিকার পাশাপাশি সংবাদ সংস্থা অন্তরা (Antara) মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে। জাতিসংঘের আহ্বানে শরণার্থীদের জন্য রিলিফ প্রেরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের জন্য সাহায্য বন্ধ ও ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের ৭ জন বাঙালি কূটনীতিকের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের খবরও ছাপা হয়। এর ফলে জুলাই মাসের মধ্যেই সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির বেশ পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরের মাসে শুরু হয় সরকারি নীতির দ্বিতীয় পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় (আগস্ট-অক্টোবর ১৯৭১)

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ইন্দোনেশিয়ার সরকারি নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায় তা হলো, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জাকার্তা সফর। ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত রুশ-ভারত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির মাত্র তিন দিনের মাথায় ১২ আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাকার্তায় সফরে যান। প্রেসিডেন্ট

সুহার্তোসহ উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। ১২-১৫ আগস্ট সফর শেষে ১৫ আগস্ট প্রকাশিত ভারত-ইন্দোনেশিয়া যুক্ত ইশতেহারে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী গমনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং এর ফলে যে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা উভয়ে একমত হন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার উন্নতির ওপর শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়া নির্ভর করে।'[৩৩] যুক্ত ইশতেহারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও এই প্রথম ইন্দোনেশিয়া সরকারিভাবে শরণার্থী ও বাংলাদেশ সমস্যা স্বীকার এবং সমধানের পথ নির্দেশ করে। রুশ-ভারত চুক্তি এশিয়ার শক্তিসাম্যে, ভারত মহাসাগর এলাকায় হুমকি হয়ে দেখা দেবে না তা শরণ সিংহের সফরের পর ইন্দোনেশিয়া পরিষ্কার হয়। যুক্ত ঘোষণায় ১৯৬৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় স্বাক্ষরিত চুক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিকসহ দ্বিপাক্ষীয় সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। চুক্তির পরপর তাই বাংলাদেশ ইস্যুতে ইন্দোনেশিয়ার সরকারি মনোভাব ভারতের কাছাকাছি আসতে থাকে। এ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গোপন বিচারের পাকিস্তানের উদ্যোগকে ইন্দোনেশিয়ার পত্রিকাগুলো নিন্দা জানায়। শেখ মুজিবের ছবিসহ *জাকার্তা টাইমস* একটি সম্পাদকীয়তে তাঁর মুক্তি দাবি করে। শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ২৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দেয়া আবেদনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গোপন বিচার যে ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করবে তাও পত্রিকাগুলো উল্লেখ করে। ৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকারের প্রকাশিত 'শ্বেতপত্র'-এর ভাষ্য সংক্ষেপে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তবে শরণ সিংহের জাকার্তা সফরের পাল্টা একটি সফরে আগস্ট মাসেই পাকিস্তানের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী শের আলী জাকার্তায় উপস্থিত হন। সরকারি ও কূটনৈতিক মহলে কিছু যোগাযোগ ছাড়া তাঁর সফরে জনমনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। এছাড়া শরণ সিংহের সফরের পরপর তাঁর এ সফরের দুরভিসন্ধিও অনেকে বুঝতে পারে।

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ইস্যুতে ইন্দোনেশিয়ার আরো কিছু ইতিবাচক মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। আগস্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাকার্তা সফরে দু'দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি ছাড়াও সেপ্টেম্বর মাসে উভয় দেশ নৌবাহিনী সংক্রান্ত পুরনো সহযোগিতাকে অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়। ইন্দোনেশিয়ার সাংবাদিক সমাজ পাকিস্তানে সাংবাদিক নিগ্রহের নিন্দা জানিয়েও বিবৃতি দেয়। ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ইন্দোনেশিয়াভিত্তিক প্রেস ফেডারেশন অব এশিয়ার পরিচালক এক প্রতিবেদনে পাকিস্তানে সাংবাদিক নির্যাতন সম্পর্কে বলেন,

> In East Bengal, a virile and idealistic press had been almost totally destroyed. About 50 well known editors had fled the

> country and in a number of cases, newspaper offices in Dacca had been razed to the ground. Arson and shelling had killed about half a dozen newspaper workers on duty. Both in East Bengal and West Pakistan the press has remained under complete censorship since the uprisings in East Bengal.[৩৪]

এ পরিস্থিতিতে ১৮-২০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাকিস্তান দূতাবাসের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রফেসর আবু হানিফার নেতৃত্বে ড. নাৎসির ও ড. মোহাম্মদ রুয়েম (Roem) অংশ নেন। মোট ২৪টি দেশের ১৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রফেসর হানিফা ছিলেন ব্রাজিল ও ইতালির প্রাক্তন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত। ড. রুয়েম ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং ড. নাৎসির ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ড. রুয়েম তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশ ইস্যুকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে না দেখে বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ দেখেছেন। তিনি বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগের আহ্বান জানান। তাঁরা কলকাতার সল্ট লেকের কয়েকটি শরণার্থী শিবিরও পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা পাকিস্তানের দু'অংশের বৈষম্য, বাঙালির সংগ্রাম ও শরণার্থীদের মানবেতর জীবনযাপন চিত্র তুলে ধরে নিবন্ধ রচনা করে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করেন। ড. হানিফা আরব বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশ ইস্যুতে নির্লিপ্ত ভূমিকার সমালোচনা করেন। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া সরকার ও মুসলিম নেতাদের বাংলাদেশের ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।[৩৫]

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এমনি পরিস্থিতিতে ইন্দোনেশিয়ার পত্রিকা ও বিরোধী দলের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় প্রাধান্য পায়। ২১ সেপ্টেম্বর *ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজারভার* পত্রিকা 'Settlement of Bangladesh Problem' শিরোনামে এক নিবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে 'যেহেতু সমস্যাটি রাজনৈতিক তাই এর রাজনৈতিক সমাধান আবশ্যক।' এতে বাংলাদেশ ও ইসলামাবাদ সরকারের দ্বিপক্ষীয় অথবা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এই সমস্যা সমাধানের সুপারিশও করা হয়।[৩৬] এসব তৎপরতার ফলে ইন্দোনেশিয়া সরকার এ পর্যায়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ড. মালিক পাকিস্তান ও ভারতের দ্বি-পক্ষীয় বৈঠকের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান।[৩৭] এর থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, ইন্দোনেশিয়া এতদিনের পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল নীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এর প্রভাব পত্রপত্রিকায়ও পড়ে। ৭ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার অবজারভার এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের সমস্যা যেহেতু রাজনৈতিক, তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তার সমাধান করা সম্ভব বলে মন্তব্য করে।[৩৮] এর ফলে

ইন্দোনেশিয়া সরকারের এতোদিনের ধারণা, 'পাকিস্তান সমস্যা সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়'—এ ধরনের মনোভাব থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসতে থাকে। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার ক্রমপ্রসারমান বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সরকার আজিজ বেগ, ড. আইএইচ কোরাশী, আমীর ফ্যান্সি, এয়ার ভাইস মার্শাল ইউসুফকে জাকার্তায় পাঠায়। জাকার্তায় বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা চালালেও পাকিস্তানের পক্ষে তেমন জনমত গড়ে তুলতে পারেন নি। বরং ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করে, ড. কোরাশী নিজেই জাকার্তায় মন্তব্য করেন, জেনারেলরা রাজনীতিবিদ নন এবং তাদের পক্ষে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানও সম্ভব নয়। যদি পাকিস্তানে একটি বেসামরিক সরকার থাকতো তবে হয়তো এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। তিনি ৫ আগস্ট প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের 'শ্বেতপত্রকে' একটি গুরুতর ভুল সিদ্ধান্ত বলেও মন্তব্য করেন। তাঁর অন্য এক সফরসঙ্গী আমির ফ্যান্সি ভুট্টোর সমালোচনা করেন। এই সফরকারী দলের অন্য সঙ্গী সাংবাদিক খালিদ হাসানকে বিনা ভিসায় ভ্রমণের অভিযোগে ইন্দোনেশিয়া বিমান বন্দর থেকেই পরের ফ্লাইটে জাকার্তা ত্যাগে বাধ্য করা হয়।[৩৯] এই ব্যর্থ সফর ও সফরকারীদের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, ইন্দোনেশিয়ার জনগণ কতটা বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

তৃতীয় পর্যায় (৩-১৬ ডিসেম্বর)

৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন দেশের সহযোগিতার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। অস্ত্র সহযোগিতা ছাড়াও জাতিসংঘের সমর্থন আদায় এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য ৬ ডিসেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক এ. ডব্লিউ শামসুল আলম পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর কাছে একটি বাণী নিয়ে ৬ ডিসেম্বর জাকার্তায় পৌঁছেন। তবে জাকার্তার কাছ থেকে এবারও পাকিস্তানি দূত সহায়তার আশ্বাস পাননি। পরের দিন ইন্দোনেশিয়ার দৈনিক *ইন্দোনেশিয়া রায়া* পাকিস্তানের দূত প্রেরণের সমালোচনা করে মন্তব্য করে, 'বাঙালির ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান এত দিনের ভুলের মাশুল দিতে পারেন।'[৪০] ৭ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার মন্ত্রিসভার এক বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন।[৪১] একই দিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ এবং উভয় সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে ইন্দোনেশিয়াসহ ১৪টি দেশ একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে।[৪২] জাতিসংঘে ইন্দোনেশিয়া যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তির পক্ষে সকল উদ্যোগকে স্বাগত জানান। ৮ ডিসেম্বর জাকার্তার একজন সরকারি মুখপাত্র স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাক-ভারত যুদ্ধে তাঁর সরকার নিরপেক্ষ থাকবে এবং যে কোনো দেশের সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করবে।[৪৩] পাকিস্তান সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে জাকার্তায় প্রেরিত ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মিয়া জিয়াউদ্দিনকে এই সিদ্ধান্ত জানান। জাকার্তা সরকার যুদ্ধে সহযোগিতা নয় বরং যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়।[৪৪] এর মাত্র ৬ দিন পর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের অবসান ঘটে। এ সময় জাতিসংঘে যুদ্ধ বন্ধের সব উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়া সমর্থন দেয়।

এভাবে দেখা যায় যে, ইন্দোনেশিয়া সরকারের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী সমস্যা নয় পাকিস্তান সঙ্কট এবং পাক-ভারত যুদ্ধ প্রাধান্য পায়। প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে একমত ছিল, বাংলাদেশ সঙ্কট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ওপর প্রভাব পড়ে এমন কোনো সংবাদ, প্রতিবেদন প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য পত্রপত্রিকাগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করায় দু'জন ছাত্রকেও গ্রেফতার করা হয়। এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও পত্রিকাগুলো সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ও পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। এর ফলে ইন্দোনেশিয়া সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও আসে। এ পরিবর্তন অবশ্যই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। তবে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের নীতির বিরুদ্ধে যেতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়া সরকার পাকিস্তান সরকারকে সরাসরি ও দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের পরামর্শ দেয়। এ সময় জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের চেষ্টা সত্ত্বেও জয়প্রকাশ নারায়ণের জাকার্তা সফর কিংবা নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বিষয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ প্রতিরোধ করা যায় নি। জুন-জুলাই মাসের পর সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তেমন বিধিনিষেধ না রাখায় এ সময় প্রচুর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, যা ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। ফলে সরকার বাংলাদেশ ইস্যুতে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে থাকে। যদিও সরকার বাংলাদেশের পক্ষে কোনো বিবৃতি দেয় নি কিংবা উন্মুক্ত প্রচারণায় সহায়তা করেননি।

পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন প্রতিনিধি দল, দূত পাঠিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের প্রতি সমর্থন ও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক সহযোগিতার চেষ্টা চালায়। যদিও সরকারি পর্যায়ে এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়া কোনো সহায়তা দেয়নি। এমনকি যুদ্ধের শেষ দিকে সামরিক সাহায্যের আশায় ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত জাকার্তায় এলে সুহার্তো সরাসরি যুদ্ধে সমর্থনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অক্টোবর মাস থেকে ইরান, লিবিয়া, জর্ডান, সৌদি আরবের মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্র পাকিস্তানে এলেও ইন্দোনেশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দেয়। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অখণ্ডতা ইন্দোনেশিয়ার কাম্য হলেও ইন্দোনেশিয়া

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, দেশটির ভূরাজনীতি, পরাশক্তির রাজনীতি ও তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে ভারসাম্যমূলক, কখনোবা মধ্যপন্থি এবং যুদ্ধের শেষদিকে ন্যূনতম নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে ইন্দোনেশিয়া মধ্যস্থতা, যুদ্ধ বন্ধে ভূমিকা রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্র অভিধান*, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৮। ইন্দোনেশিয়ার মোট আয়তন ৭৪০৯০৫ বর্গমাইল

২. George Thomas Kwrian (ed.), *Encyclopedia of the Third World,* Revised Edition, Vol. II London: Manseel Publising, 1982, p. 815

৩. Peter Palomka, *Indonesia's Future and South-East Asia, Adelphi Papers*, No. 104 London: The Internation Institute for Strategic Studies, 1974, p. 18

৪. *Ibid.*

৫. *Ibid.* p. 35

৬. রুশ প্রস্তাব ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিক্রিয়ার জন্য দ্রষ্টব্য *Indonesia Raya*, 26 April 1969.

৭. দ্রষ্টব্য *Sinar Harapar,* 23 August, 1971; *Business News* (Indonesia), 27 August 1971

৮. *Asian Recorder* (New Delhi, Vol. XVII, 1971, p. 10323, ১৯৬৫ সালে মোট দেড় লাখ রাজবন্দি গ্রেফতার হয়। তাদের মধ্যে ৪৫ হাজার ছিল কমিউনিস্ট

৯. Peter Palomka, *Ibid*, p. 21

১০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ভূমিকা' *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা জুলাই, ২০০০, পৃ. ৩২-৩৩।

১১. George Thomas Kwrian (ed.), *Ibid,* P. 826, ১৯৯৫ সালের হিসেবে শিক্ষিত ৮৩.৮%।

১২. *Asian Recorder, op.cit.,*P. 10323.

১৩. মুসা আনসারী, *ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২০৩

১৪. *Pakistan Horizon,* Vol. XXIV, No. 2, 1971. P. 155

১৫. *Ibid,* p. 156

১৬. তুরস্ক ও মালয়েশিয়া ৩ এপ্রিল, লিবিয়া ৭ এপ্রিল, ইয়েমেন ৭ এপ্রিল, সৌদি আরব ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে সরকারি বিবৃতি দেয়। এর আগে ২৯ মার্চ ওআইসির মহাসচিব টেংকু আবদুর রহমান ও ৩০ মার্চ ইউনাইটেড আরব আমিরাত অনুরূপ বক্তব্য

দেয়। দ্রষ্টব্য আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭

১৭. *The Detkarta Times*, 15 April 1971

১৮. 'আমরা' সংগঠনের ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকা, মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ* (ঢাকা : ত্রিভুজ প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৯-৫২; আরো দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৪র্থ খণ্ড ঢাকা : তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৩৭৯-৮২, ৩৮৪-৮৫, ৩৯০-৯৪, ৩৯৯-৪০৩, ৪০৭-৪১৫, ৪২১-৪৫৮

১৯. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৯

২০. *Hindustan Times,* 4 May 1972

২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল ১৯৭১

২২. *দৈনিক পাকিস্তান,* ১১ এপ্রিল ১৯৭১

২৩. *Hindustan Times, Ibid*

২৪. *Pakistan Horizon*, vol. XXV, No. 2, 1971, p. 69

২৫. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৫

২৬. এ পত্রিকা বিভিন্ন সময় পাকিস্তানপন্থি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৭ এপ্রিল এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করে যে, ভারত শেখ মুজিব ও তাঁর সমর্থকদের ব্যাপক অস্ত্র সহায়তা দিয়ে পাকিস্তানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। দ্রষ্টব্য *Pakistan Horizon, Ibid,* p.67

২৭. *Pakistan Horizon, op.cit.,* p.80

২৮. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯৩

২৯. *ঐ*

৩০. *Bangladesh Documents*, Vol. I, Reprinted, (Dhaka, UPL, 1999)

৩১. *Pakistan Horizon, Ibid,* Vol. 3, 1971, p. 76

৩২. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

৩৩.'*Bangladesh Documents*, Vol. 11, Reprinted, *op.cit.*, p.158-159

৩৪. Shri Ram Sharma, *Ibid,* 7 December 1971, p. 338

৩৫. *Asian Recorder*, *Ibid,* p. 10403

৩৬. 'Tragedy of a Country', *Kiblet* (Periodical), October 1971

৩৭. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৮

৩৮. *Hindustan Standard*, 24 September 1971

৩৯. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, খণ্ড ১৪, পৃ. ৬২৭

৪০. *ঐ, খণ্ড* ৪, পৃ. ৪৫৫

৪১. *Indonesian Raya*, 7 December 1971

৪২. *Bangladesh Documents*, *op.cit.*, po.217-218

৪৩. *The Djakarta Times*, 8 December 1971

৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১। হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার গণমাধ্যম ও জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়ার মতো সচেতন না হলেও ইন্দোনেশিয়ার মতো এ দেশটিও বাঙালির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। যদিও সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ঐক্যের পক্ষে। পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার সূচনার পাঁচ দিনের মধ্যেই ৩০ মার্চ ১৯৭১ মালয়েশিয়ার দৈনিক *উতশান মালয়েশিয়া* এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির সমালোচনা করে।[১] যদিও ৩ এপ্রিল প্রথম এ ব্যাপারে সরকারি নীতি সম্পর্কে জানা যায়। ঐদিন এক বিবৃতিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের সঙ্কটকে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এতে কারো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেন।[২] পাশাপাশি ২৫ এপ্রিল সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের ব্যাপারে, তিনি নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।[৩] অবশ্য মালয়েশিয়ার অন্যতম বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (DAP) ছিল বাঙালির মুক্তির পক্ষে। ৩০ এপ্রিল এ দল এক বিবৃতিতে তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানায়। মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের কাছে গণহত্যা বন্ধের জন্য একটি স্মারকলিপিও পেশ করে। এতে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপিসহ হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল Fan Yew Teng ও সাংগঠনিক সম্পাদক Lam Thye. যদি হাইকমিশনার তাদের অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং এ অভিযোগ ভারতীয় প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত বলে মন্তব্য করেন। এপ্রিলের মধ্যেই DAP ছাড়া আরো তিনটি বামপন্থি

দল Partia, Socialist Rayat (কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক দল) ও লেবার পার্টি অব মালয়েশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন জানায়।

মে-জুন মাসে মালয়েশিয়ার পত্রিকাগুলো বিশেষ করে *Straits Times, Straits Echo* মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ৮ জুন *Straits Times* এক সম্পাদকীয়তে ৪০ লাখ বাঙালি শরণার্থীর ভারতে অবর্ণনীয় দুর্দশা, এদের ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতির ও বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। এতে স্পস্টভাবে বলা হয় যে, কোনো বিবেচনায় পাকিস্তান সঙ্কট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত।[৪] *Straits Echo* ১০ জুন সংখ্যায় একই ধরনের মন্তব্যের পাশাপাশি পাকিস্তানে একটি বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের পাকিস্তানকে চাপ দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করে। পত্রিকাটি জোর দিয়ে বলে, বর্তমান সঙ্কটের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ দায়ী। পত্রিকাটি বাংলাদেশ সমস্যার সামগ্রিক উন্নতির জন্য জাতিসংঘের নিরপেক্ষ ভূমিকার ওপর জোর দেয়।[৫]

তবে মালয়েশিয়া সরকারিভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার কথা বললেও পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করেনি। সরকারের পাশাপাশি পাকিস্তানে মালয়েশিয়ার দূতাবাস পাকিস্তানের পক্ষে মন্তব্য করে। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার Mohammad Sopice বলেন, তাঁর সরকার পাকিস্তানের সমস্যাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বিবেচনা করে। তবে এপ্রিলের শেষ দিকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ৪০ হাজার ডলার সাহায্য ঘোষণা করা হয়।[৬] ১৯৭১ সালে ১৮-২০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে গান্ধী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪টি দেশের মোট ১৫০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। ২০ সেপ্টেম্বর সম্মেলন শেষে নেয়া সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনাকে মানবিক ইতিহাসের বড় বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করে এর সন্তোষজনক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মালয়েশিয়ার ভি. ডেভিড ও M. Soorian এতে অংশ নেন। ডেভিস বক্তৃতায় তাঁর দেশের সরকারের বাংলাদেশ ইস্যুতে মৌন ভূমিকার সমালোচনা করে মালয়েশিয়ানদের বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমর্থনের আহ্বান জানান। তিনি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বিশ্ব সম্প্রদায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তৃতার শেষ কয়েক লাইন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, This butchery and massacre of the people and this horrible situation need to be condemned and we people from Malaysia will stand with the people of Bangladesh in their just and fair struggle to live as a free people.[৭] মালয়েশিয়ার ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন পার্টির নেতা M. Soorian

জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বক্তৃতায় বলেন, The birth of Bangladesh was formally baptised at Mujibnagar in East Bengal on 17th April 1971 by the nation-nouveallx acting President Seyed Nazrul Islam. History was made with the unfurling of the Bangladesh flag to the accompaniment of Tagoers "Amar Sonar Bangla" The acting President pointed out that the Provisional Government did not exist on paper.[৮] তিনি বক্তৃতার শেষে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব দেন, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১. দ্রুত নিঃশর্ত শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি; ২. বাংলাদেশ থেকে ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার এবং ৩. বাংলাদেশকে পৃথক বিদেশি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে গিয়েও তাঁরা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। যে কারণে মালয়েশিয়ার সরকার এ সময় থেকে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে কোনো বক্তব্য দেয়নি।

ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে মালয়েশিয়া অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। যদিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ইস্যুকে অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবেই মালয়েশিয়া বিবেচনা করেছে। ৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার আহ্বান জানান। ঔদিনই *Straits Times* প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের দায়ী করে। এতে আরো বলা হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ছিল।[৯] ৯ ডিসেম্বর মালয়েশিয়ার *Nanyung Sing Pan* পত্রিকার প্রতিবেদনে মালয়েশিয়ার জনগণের মনোভাবের আরো স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। এতে বলা হয় :

The ruthless repression by the West Pakistan army of the rebels in Bangladesh and the failure to take correct steps for restoring peace in time by respecting the result of the election, has brought about the present tragedy is now too late. The crisis has erupted into war and president Yahya Khan must be held responsible for what happened.[১০]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দিলেও মালয়েশিয়ার সরকার নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। ইন্দোনেশিয়ার মতো মালয়েশিয়ার সরকারও পাকিস্তানের অখণ্ডতার কথা বললেও পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন দেয়নি, কোনো আর্থিক সহায়তা বা অস্ত্র দিয়েও সহায়তা করেনি। মুসলিম ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মতোই ভূমিকা পালন করেছে। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই

মালয়েশিয়া দেশটিকে স্বাগত জানায়। *Utusan* পত্রিকায় ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায়, 'A New Nation Born' শিরোনামে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পটভূমি, পাকিস্তানের পরাজয় এবং বাংলাদেশের জন্ম সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করে।'[১১] পাশাপাশি বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম মুসলিম দেশ।

তথ্যসূত্র :

১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৫ম খণ্ড, ঢাকা : তথ্যা মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ.২৪২

২ *Pakistan Horizon,* Vol.XXIV, No.2, 1971, p.157

৩ *ISDA News Review on Pakistan*, April 1971, p.27

৪ *Hindustan Times,* 1 May 1971

৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *১৪ খণ্ড*, পৃ.৫৫০

৬ *ঐ, পৃ.*৫৬৯

৭ *Morning News*, 12 April 1971

৮ *Hindustan Standerd,* 26 June 1971

৯ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *১৩ খণ্ড*, পৃ.৬৮৬-৬৮৭

১০ *ঐ, পৃ. ৬৮৭*

১১ ঐ, পৃ. ৬৮৯

তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য

পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার

আংকারা, ৭ই ডিসেম্বর (এএফ-পি)।—প্রধানমন্ত্রী নিহাত এরিম আজ বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংকট পাকিস্তানের অভ্যন্ত- পূর্ব পাকিস্তানের ... রীণ ব্যাপার।

প্রয়োজনের সময় তুরস্ক পাকিস্তানকে সাহায্য দেবেঃ ওলকে

রাওয়ালপিন্ডি, ৩০শে নবেম্বর (এপিপি)।—তুর্কী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জনাব ওসমান ওলকে এখানে গতরাতে বলেন, তুরস্ক এবং পাকিস্তান হলো উত্তম বন্ধু এবং প্রয়োজনের সময় তুরস্ক পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। তিনি তাঁর সম্মানে পররাষ্ট্র দফতর কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, তুরস্ক ও পাকিস্তানের ... স্বার্থসর্বস্ব নয়। এই দুই দেশের মধ্যে ... ভিত অনেক দৃঢ়। তাছাড়া বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী এক।

তুর্কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সারাবিশ্বে তাদের অনেক বন্ধু আছে। এর মধ্যে কতকগুলো বন্ধু আছে যারা আরো নিকটতর। পাকিস্তান তুরস্কের এমনই এক বন্ধু ... উপমহাদেশে গোলযোগ ...

পাকিস্তানের প্রতি মিসরের সমর্থন অব্যাহত থাকবে

১৭ই জুন পিন্ডিতে গবর্ণর সম্মেলন

এম এম আহমদ ২৩শে জুন কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণা করবেন

মরক্কো পাকিস্তানকে সমর্থন করিবে

—মাহমুদ আলী

★ নাইজিরিয়া কঙ্গো সেনেগাল ফিলিপাইন ইন্দোনেশীয়া ও মরিশাসের ঘোষণা ★

পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি পাকিস্তানের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিষয়

এম এম আহমদের অবস্থার ক্রমোন্নতি

ইসলামী সেক্রেটারিয়েট প্রধান টেংকু আবদুর রহমানের স্পষ্ট ঘোষণা

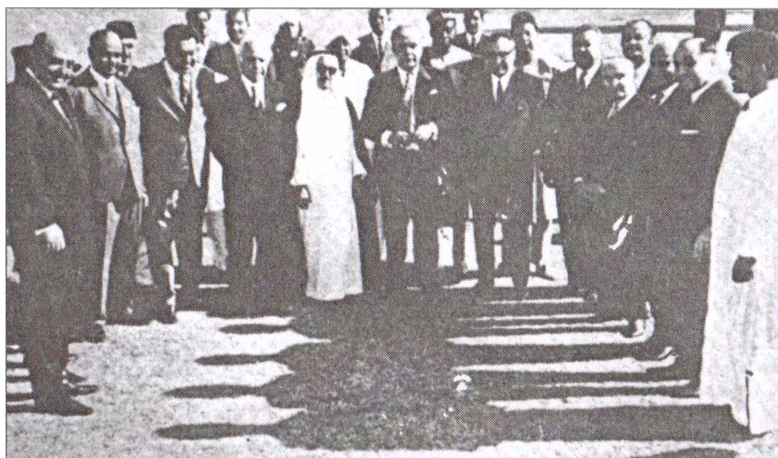
পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী আভ্যন্তরীণ ব্যাপার

পাক-জর্দান মৈত্রী সমিতির সভাপতি খালিদ আবু হাসান করাচি বিমানবন্দরে সাহায্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন পাকিস্তানি কর্মকর্তার হাতে

ইসলামী সচিবালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আবদুর রহমান নামাজ পড়ছেন বায়তুল মোকাররমে, বড় আকারে এই ছবি ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়

১৪ অক্টোবর ১৯৭১, ইরান সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

১৫ নবেম্বর ১৯৭১, আবুধাবীর রাষ্ট্রপ্রধানের উত্তরাধিকারী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ খলিফা ইবনে জায়েদ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনারত



মুসলিম দেশগুলোর মিশন-প্রধানদের সঙ্গে পাক প্রেসিডেন্ট

পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তুর্কি প্রতিনিধিদলের নেতা

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

সৌদি আরব

মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরবের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং পক্ষে। ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (Organization of the Islamic Conference), আরব লীগ (Arab League), ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেসও (World Muslim Congress) মুসলিম বিশ্বের অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে এবং একাত্তরের বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত বৈঠক, বিবৃতি ও যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়। মুসলিম বিশ্ব পাকিস্তানকে নৈতিক, আর্থিক এবং কোনো কোনো দেশ অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। এমনকি কোনো কোনো দেশ বাঙালির ওপর পাকিস্তান সামরিক জান্তার গণহত্যাকে সমর্থন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যার সূচনার পরপর ২৭ মার্চ ইন্দোনেশিয়া, ২৮ মার্চ ইরান, ৩০ মার্চ ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক (UAR), ৩ এপ্রিল তুরস্ক ও মালয়েশিয়া, ৭ এপ্রিল লিবিয়া, ১২ এপ্রিল ইয়েমেন, ১৫ এপ্রিল সিরিয়া এবং ২৮ এপ্রিল সৌদি আরব সরকারিভাবে পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেয়।[১] এপ্রিলের মধ্যেই ২২টি ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রের অধিকাংশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং এ ব্যাপারে ভারতের ভূমিকাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ শরণার্থী হিসেবে বিপুলসংখ্যক বাঙালির ভারত গমন বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের কাছে প্রাধান্য পায়নি। মূলত চীন-মার্কিন অস্ত্র ভাণ্ডার এবং মুসলিম বিশ্বের নৈতিক, আর্থিক এবং অস্ত্র সহযোগিতা পাকিস্তানকে বাঙালির ওপর ব্যাপক গণহত্যায় মনোবল জোগায়। মুসলিম বিশ্বের এহেন ভূমিকা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য ছিল বিপন্ন বিস্ময়। নিজ নিজ দেশে বসে বিবৃতি প্রদান করলেও মুসলিম বিশ্বের কোনো শীর্ষ স্থানীয় নেতা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির ওপর

ব্যাপক গণহত্যা সরেজমিনে দেখার জন্য শত্রু অধিকৃত বাংলাদেশে আসার প্রয়োজন অনুভব করেনি। বরং সৌদি আরব, জর্ডান, ইরান, লিবিয়া একধাপ এগিয়ে গিয়ে অক্টোবর থেকে পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে। এসব অস্ত্র মূলত বাংলাদেশের মুসলমানসহ নিরীহ বাঙালিদের হত্যার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য দুটি। **প্রথমত,** সৌদি আরব একাত্তরে কেন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল তা চিহ্নিত করা এবং **দ্বিতীয়ত,** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরব কী ভূমিকা নিয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা।

এক. সৌদি আরবের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ

প্রথমত, সৌদি আরবের দৃষ্টিতে এ মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের দু'অংশের ইসলামি সংহতি বিনষ্টের এক অপপ্রয়াস হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক দলগুলো এবং সরকারি প্রচারণায় শরণার্থী হিসেবে ভারতে গমনকারী অধিকাংশকে হিন্দু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো কোনো প্রচারমাধ্যম ভারতের প্ররোচনায় মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হিসেবেও দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাকামী দলগুলোকে ভারত ও হিন্দুদের দোসর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে 'ইসলামবিরোধী' এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের 'ভারতীয় চর' ও 'কাফের' আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে পরিপূর্ণরূপে ধর্মীয়করণ করা হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বক্তব্যে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মুসলিম বিশ্বের এ ধারণাকে আরো সংহত করেছে।[২] প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ছয় সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদে কমিউনিস্টপন্থিদের প্রাধান্য মুসলিম বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সন্দেহের জন্ম দেয়। এই কমিটিতে তিনজন যেমন— ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মো) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ ছিলেন কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত। অপর সদস্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে পশ্চিমা বিশ্ব ভারত ও সোভিয়েতপন্থি হিসেবে প্রচার করে। পাকিস্তানি কোনো কোনো উৎসে তাকে জন্মগতভাবে হিন্দু এবং ৮ বছর বয়সে হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৩] উল্লিখিত দলগুলো ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত। অপর সদস্য মনোরঞ্জন ধর ছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা এবং ভাষা আন্দোলন থেকেই পাকিস্তানের বৈষম্য নীতিবিরোধী। অবশ্য সর্বশেষ সদস্য খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ না থাকারই কথা। কারণ একাত্তরে বিভিন্ন সময় মার্কিন-পাকিস্তানি চক্রের সঙ্গে তাঁর আঁতাত বর্তমানে বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে

প্রমাণিত। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং বাঙালিদের এমনি মানসিকতাকে মুসলিম বিশ্বের কাছে এ ধারণার জন্ম দিয়েছিল স্বাধীনতার পর দেশটি হবে কমিউনিস্ট ও ধর্মহীন একটি রাষ্ট্র। আর দেশটি হবে হিন্দুশাসিত ভারতের মিত্র রাষ্ট্র, যা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন সৌদি আরবকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। ভারত, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। বহির্বিশ্বে বিভিন্ন মিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। সুয়েজ সঙ্কট ও ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আরব বিশ্বকে ভারত সমর্থন দেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সমর্থনকে মূলত তারা পাকিস্তান তথা ইসলামি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব ধ্বংসের প্রচেষ্টা হিসেবেই মনে করেছে। একাত্তরের এপ্রিল মাসের মধ্যেই পকিস্তানের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম বিশ্বের নেতাদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। বরং ৯ আগস্ট সম্পাদিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তি, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠন, ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা, ১৬ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। অন্যাদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশের ১৯৭০ সাল থেকেই সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। যেমন প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যুর পর মিসরে সোভিয়েত প্রভাব ক্রমান্বয়ে হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট সাদত সোভিয়েতের সাথে আলোচনা না করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরাইলের সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্তে উপনীত হয়। মে মাসে মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম রজার্সের কায়রো সফরের পর আনোয়ার সাদত ভাইস প্রেসিডেন্ট যুদ্ধমন্ত্রী, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানসহ বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করেন। তারা সকলে কট্টর মস্কোপন্থি এবং সাদতের মার্কিনপ্রীতির বিরোধী ছিলেন।[৪] ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারতের পক্ষাবলম্বন এবং ভারত, সোভিয়েত চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে এ ধারণার জন্ম দেয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ভারত মহাসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যই হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী টার্গেট। ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ ইস্যুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষ সমর্থন করায় সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সোভিয়েত ও ভারতবিরোধী হয়ে ওঠে, যার প্রভাব মুক্তিযুদ্ধের ওপর পড়ে।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের বিশেষ সামরিক সম্পর্ক এবং সৌদি আরবের নিরাপত্তা বাহিনীর পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীলতা সৌদি আরবের

পাকিস্তানপন্থি নীতি অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশটি সম্পর্কে সৌদি আরবসহ ইসলামি বিশ্বের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সৌদি আরব হচ্ছে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র, যে পাকিস্তানকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান পশ্চিমা প্রভাবিত আরব স্বার্থবিরোধী বাগদাদ প্যাক্ট, SEATO, CENTO চুক্তি স্বাক্ষর করে মুসলিম বিশ্বের বিরাগভাজন হয়। এসব চুক্তি সম্পাদনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৌদি আরব পাকিস্তানকে আরব ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে।[৫] অবশ্য রাজতন্ত্রশাসিত আরব বিশ্ব এবং সামরিক স্বৈরাচারশাসিত পাকিস্তানের একই চরিত্রের রাষ্ট্র নায়কদের মধুচন্দ্রিমা হতে বেশি সময় লাগেনি। ষাটের দশকে এসেই পাকিস্তান ও সৌদি সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে মধুর হয়েছে এবং পাকিস্তানের সহায়তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি সম্পর্কেও নৈকট্য লাভ করতে শুরু করেছে। প্রতিদানস্বরূপ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকলেও সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক, জর্ডান ও ইন্দোনেশিয়া প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়।[৬] ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পাকিস্তানকে আরব বিশ্বের নৈকট্য এনে দেয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তান সর্বপ্রথম আরব স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। এই ভূমিকার সুবাদে ১৯৬৯ সালে রাবাতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামি সম্মোলন সংস্থার (OIC) সম্মেলনে পাকিস্তান আরব বিশ্বের সদস্য না হয়েও আরব বিশ্বের মুখপাত্রে পরিণত হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে সৌদি আরব, জর্ডানসহ আরব বিশ্বের অনেক দেশ সামরিক ট্রেনিং, অস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৭১ সালের মধ্যেই দেখা যায় শুধু সৌদি আরবে প্রায় ৪০০০ পাকিস্তানি সৈন্য ও বিমান বাহিনীর সদস্য কর্মরত ছিলেন। তারা মূলত সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী ও সামরিক প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত।[৭]

চতুর্থত, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরব বিশ্বের নতুনভাবে নৈকট্যতা গড়ে ওঠার কারণে এ দুটি দেশকে পাকিস্তানের পক্ষে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণে সহায়তা করে। পাকিস্তানের মাধ্যমেই চীন ও মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ায় উভয় দেশ সমানভাবে পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল।[৮] অন্যদিকে একই সময় অর্থাৎ সত্তরের দশক থেকে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের প্রারম্ভে পাকিস্তানের মাধ্যমে আরববিশ্বে চীনের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। মিসর, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক এবং দক্ষিণ ইয়েমেন একাত্তরেই চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। একই বছরের ২৯ মার্চ কুয়েত, ৮ আগস্ট তুরস্ক, ১৬ আগস্ট ইরান, ৯ নভেম্বর লেবানন, ১৪ ডিসেম্বর সাইপ্রাস গণচীনকে স্বীকৃতি দেয়।[৯] চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বাণিজ্যিক লেনদেন থেকেও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ১৯৬৮ সালে

পরস্পরের মধ্যে ১২০ মিলিয়ন ডলার বাণিজ্য হয়, ১৯৭০ সালে তা ১২১, ১৯৭১ সালে ১২৫ এবং ১৯৭২ সালে এক লাফে ১৮১ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।[১০] সৌদি আরব চীনকে ১৯৭১ সালে স্বীকৃতি না দিলেও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চীন-সৌদি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। জাতিসংঘে ১৯৭১ সালে চীনের সদস্যপদ লাভে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। জাতিসংঘে ১৯৭১ সালে চীন পাকিস্তানের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো হয়ে ওঠে এ ব্যাপারে চীনের সমর্থনকারী।

পঞ্চমত, মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন না করার মূলে সৌদি আরবের জাতীয় স্বার্থও কাজ করেছিল। আরব বিশ্বের বিচিত্র রাষ্ট্রকাঠামোতে রাজতন্ত্র, সামরিক/আধা-সামরিক, আধাগণতন্ত্র ও বৈপ্লবিক সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এসব দেশের অনেকগুলোর মধ্যে সীমান্ত, আদর্শিক ও জাতীয়তার সমস্যা রয়েছে। এসব দেশের রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের স্বার্থেই মুক্তিযুদ্ধের মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

ষষ্ঠত, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক দল যেমন জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, পিডিপি পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচার ও কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। প্রায় সকল মুসলিম দেশে পাকিস্তানের দূতাবাস থাকায় দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতবিরোধী প্রচারণা চালাতে থাকে। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যখন গণহত্যা চলছিল এবং বহুলোক গৃহহারা সে সময় ২৭০১ জন বাঙালি হজে গমন করেন।[১১] পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিতভাবে বাঙালি হাজিদের এ দলে সরকারি উদ্যোগে কিছু বাঙালি দালাল পাঠায়। পাকিস্তান থেকেও অনুরূপ একটি দল পাঠানো হয়। আরবসহ মুসলিম বিশ্বের বহু হাজির মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতবিরোধী মনোভাব চাঙ্গা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার পর হাজীদের বড় অংশ বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাধীনে দেশে ফিরে এলেও স্বাধীনতাবিরোধীদের এ অংশটি পাকিস্তান হয়ে পরে বাংলাদেশে আসে।

সপ্তমত, সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের মূলে ওআইসির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার ৩ দিনের মধ্যেই ২৯ মার্চ ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিংকু আবদুর রহমান এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন। ভারতকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি বাইরের কোনো দেশের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'[১২] মে মাস পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করলেও জুনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ২২ সদস্যবিশিষ্ট ইসলামি সম্মেলন সংস্থার অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে মূলত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়।[১৩] সম্মেলনের শুরুর দিন (২৫ জুন) প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইসলামি সম্মেলন

সংস্থার কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের জন্য সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই বার্তায় বলেন :

> বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান। ইয়াহিয়া সরকার জনগণের নির্বাচনের রায়কে অগ্রাহ্য করে বিশ্বাসঘাতকের মত অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছে বলেই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। তারা দশ লাখের বেশি লোককে হত্যা করেছে। ৬০ লাখের বেশি লোক গৃহহারা হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা মসজিদসমূহ ধ্বংস করেছে, মসজিদের ইমামদের এবং নামাজরত মুসলমানদের গুলি করে হত্যা করেছে। আর তারা এসব করেছে ইসলামের নামেই। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে অনুরোধ যেন তারা বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার রক্ষার জন্য সম্মেলনে প্রভাব খাটান।[১৪]

যদিও এই চিঠি সম্মেলন সংস্থা কিংবা স্বাগতিক দেশ সৌদি আরবের মাঝে কোনো সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং ঐদিন (২৫ জুন) ওআইসির অধিবেশনে জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানো হয়।[১৫] অধিবেশন শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিদেশি শক্তিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়।[১৬] অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানকে সহযোগিতার মত ব্যক্ত করে। মূলত জেদ্দায় সম্মেলনের পর পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের সহযোগিতার আশ্বাস পায়। সম্মেলনে ইরান সঙ্কটকালে সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কারণ তাদের মতে ইসলামি সংহতি রক্ষার জন্য তা ছিল জিহাদের মতো নৈতিক কর্তব্য।[১৭]

অষ্টমত, পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের ভৌগোলিক নৈকট্যতা, সাংস্কৃতিক মিল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক এবং উর্দু ও আরবি ভাষার নৈকট্য দুটি দেশকে ক্রমান্বয়ে কাছে এনেছে। বিবদমান বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক সময় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের কোনো মৌলিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব না থাকায় সৌদি-পাকিস্তান সম্পর্ক সবসময়ই মধুর। অন্যদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের এমনকি কোনো মুসলিম দেশের সীমান্ত নেই। ভৌগোলিক দূরত্ব, সাংস্কৃতিক ও ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধান এবং আরব বিশ্বের বাংলাদেশে তখনো কোনো বড় ধরনের অর্থনৈতিক প্রকল্প ও লেনদেন না থাকায় মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পাকিস্তানের মতো ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি।[১৮]

নবমত, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি ইসরাইলের নীতি মুসলিম বিশ্বকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই ইসরাইলি সংসদ

(KNESSET) বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি সামরিক চক্রের 'পাশবিক ও বেপরোয়া ধ্বংসলীলাকে' নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাস করে। এমনকি তাদের রেডক্রস বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওষুধ, কাপড় ও খাবার পাঠায়। যদিও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রত্যাখ্যান করে। অপর একটি ঘটনা হচ্ছে, ১৬ সেপ্টেম্বর জনৈক মাহমুদ কাশেম জেরুজালেমে উপস্থিত হন। তিনি নিজেকে বাংলাদেশের দূত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে জানান, বাংলাদেশের জনসাধারণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসরাইলের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে কোনো বিবেকের দংশন অনুভব করে না। তিনি জেরুজালেমের পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সাংবাদিকদের জানান, ইসরাইলের সঙ্গে তাঁর আলোচনা সফল হয়েছে। ইসরাইল বাংলাদেশকে সেনাবাহিনী, গোলাবারুদ, ক্ষুদ্র অস্ত্র, মেশিনগান, বিমানবিধ্বংসী কামান, ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে।[১৯] এই মাহমুদ কাশেমের পরিচয় আজো জানা যায়নি। তার সম্পর্কে মুজিবনগর সরকার কোনো তথ্য দেয়নি। পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের খবরাখবর পরিবেশনে অত্যন্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দিলেও এই সংবাদটি পরিবেশনে তাদের উদারতা সন্দেহের জন্ম দেয়। সকল পত্রিকায় ফলাও করে এ সংবাদ পরিবেশন দ্বারা পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সরকারের ইসরাইলি যোগাযোগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দিতে চেয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের কাছে এটাই প্রচার করা হয়েছিল, বাংলাদেশ ইসলামের শত্রু ইসরাইলি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে। পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো দেশের সংবাদমাধ্যম বা উৎস থেকে এ ঘটনার কোনো সমর্থন না পাওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয়, মাহমুদ কাশেম ইস্যুটি হয়তো পাকিস্তান সামরিক চক্রের কোনো সাজানো নাটক হয়ে থাকবে। তবে ইসরাইলের অর্থ, অস্ত্রসহ যাবতীয় সাহায্য প্রত্যাখ্যান মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয়।[২০] বাঙালির সেই দুর্দিনে যদি ইসরাইলের সাহায্য নেয়া হতো সেটি ছিল আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে ইসরাইলের এক কূটনৈতিক বিজয়। অন্যদিকে পাকিস্তানও এ বিষয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হতে পারতো। যখন আরব বিশ্ব সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে, তখন বাংলাদেশের পক্ষে সহযোগিতা নেয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা না করে বাংলাদেশ আরব বিশ্বকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাই দিয়েছিল।

দশমত, বলা হয়ে থাকে, সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের বৈষম্য, গণহত্যা সম্পর্কে আরব বিশ্ব তেমন কোনো সংবাদ পায়নি।[২১] শুরু থেকে তাই মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট হিসেবে তাদের কাছে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল দেশ মিসরের পত্রিকায় মে মাসের আগে পর্যন্ত

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কোনো তথ্য পরিবেশিত হয়নি।[২২] বলা চলে, কিছুটা ইনফরমেশন গ্যাপের মতো পরিস্থিতি ছিল। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফরকারী মিসরীয় পত্রিকা *আল আহরাম*-এর সম্পাদক মোহাম্মদ হাসনাইন হেইকেল বলেন :

> বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদাররা যে গণহত্যা চালিয়েছে সে সম্পর্কে আরব বিশ্বে ব্যাপক অজ্ঞতা রয়েছে। বাংলার গণহত্যা বিশ্ব সংবাদপত্রের একটি বহুল প্রচারিত ব্যাপার সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং পাকিস্তানি অপপ্রচার আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিষয়টিকে বিতর্কিত ব্যাপার হিসেবে উপস্থাপিত করেছে।[২৩]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিংশ শতকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দানে ধন্য সহজতর সংবাদ প্রবাহের যুগে এ ধরনের ইনফরমেশন গ্যাপ ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ ও কান ঢেকে রাখার মতো ব্যাপার নয় কি? প্রকৃতপক্ষে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তানকেন্দ্রিক বিবেচনাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

২. মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরবের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই সৌদি আরব বাস্তব অবস্থার মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ না করেই একতরফাভাবে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। সৌদি প্রশাসন ও গণমাধ্যম পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সৌদি পত্রিকাগুলোতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গণহত্যাকে বিধিসম্মত ও প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশন করে। সৌদি আরবের দুটো প্রভাবশালী পত্রিকা জেদ্দা থেকে প্রকাশিত *আল মদিনা* এবং *আল বেলাদ* এপ্রিলের প্রথম দিকে এক রিপোর্টে উল্লেখ করে পাকিস্তানের আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয় ২৬ মার্চ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।[২৩] ৮ এপ্রিল *আল মদিনা* প্রকাশ করে 'A Saluation to Pakistan' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন প্রবন্ধে বলেন, 'Mujib behaved like a gambling thoughtless person, who is thirsty for power, even though this may be at the expense of his nation and people."[২৫]

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার সত্যি ঘটনাবলি *আল মদিনার* এই বক্তব্য অনুপস্থিত। বরং শেখ মুজিবকে দায়ী করা হয়েছে সুকৌশলে। অবশ্য সৌদি সরকারের মনোভাব প্রথম প্রকাশিত হয় এপ্রিলের শেষ দিকে। ২৮ এপ্রিল সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ ওমর সাকাফ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের 'আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়' সৌদি সরকারের

পূর্ণ এবং অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। মন্ত্রীর এই বিবৃতি সৌদি আরব রেডিও থেকে প্রচারিত হয়। মন্ত্রী বিবৃতিতে বলেন, 'সৌদি আরব ও পাকিস্তান পরস্পর শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। দুদেশের পারস্পরিক ধর্মীয় বন্ধন ধর্ম দ্বারা আবদ্ধ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হলে সৌদি আরব নীরব থাকবে না।'[২৬]

সৌদি আরব সরকার এই মনোভাবের মাধ্যমে ভারতকে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়েছে। কারণ তেল ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত সৌদি আরবসহ অন্যান্য তেল সমৃদ্ধ আরব দেশের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে তারা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রভাবিত করার চেষ্টাও করেছে। পাকিস্তান সরকার সৌদি মন্ত্রীর এ বিবৃতিকে ২৯ এপ্রিল *দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, দি পাকিস্তান টাইমস, পূর্বদেশ*সহ অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সকল পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করে। এই বিবৃতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রিয় মুসলমানদের স্বভাবতই সৌদি আরবের তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই সৌদি আরব পাকিস্তানকে সমর্থনের পাশাপাশি নগদ ১০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয় বলে ভারতীয় সরকারি সূত্র উল্লেখ করে।[২৭] পাকিস্তান সরকার এ তথ্যটি স্বীকার না করে ১১ মে করাচিতে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, পাকিস্তান সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ১০০-১২০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য লাভের চেষ্টা করছে। মূলত বিদেশি ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য এ অর্থ দরকার হবে। অবশ্য পাকিস্তান সরকারের অন্য এক সূত্রে বলা হয়, সৌদি আরব, কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশগুলো পাকিস্তানকে ৫০-৬০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[২৮] এই তথ্যটি ভারতীয় সূত্রে পরিবেশিত তথ্যের সমর্থন দেয়। অন্যদিকে ২০ মে পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আল মুতালিকের সাংবাদিকদের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌদি সাহায্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, তাঁর দেশ পাকিস্তান চাওয়া মাত্র বিনা শর্তে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য দেবে। করাচিতে পরিবেশিত সরকারি সূত্রের ১১ মে তারিখের তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।[২৯] সৌদি সাহায্যপ্রাপ্তির এ ব্যাপারটি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু পরবর্তীকালে প্রকাশিত না হলেও এ অর্থের লেনদেন যে হয়েছিল তা এসব তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

মে মাসে সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বের চেয়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ১ মে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি, ২ মে পাকিস্তানে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত সৌদ বিন আবদুল রহমান, ৬ মে জর্ডানের বাদশাহ হোসেন, ২৮ মে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও ঐক্যের পক্ষে জোরালো বিবৃতি দেন।[৩০] আরব লীগও পিছিয়ে ছিল না। তারা এ মাসেই বাংলাদেশের ঘটনার জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে বিবৃতি দেয়। সৌদি পত্রিকাগুলোও এ মাসে

পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাঙালিদের বিপক্ষে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখে। *আল বেলাদ* দীর্ঘ রিপোর্টিংয়ে মন্তব্য করে :

> পাকিস্তান ভারতের হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। পাকিস্তান সৌদি আরবের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতম। কারণ পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ এবং এ দেশটি আরব স্বার্থের ব্যাপারে সর্বাধিক সমর্থন জ্ঞাপনে কখনই কোন দ্বিধা প্রকাশ করেনি। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিরা সার্বিকভাবে দায়ী। রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কার্যকলাপের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করা মোটেই উচিৎ নয়।[৩১]

আল বেলাদ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে মূলত পাকিস্তানের পক্ষেই কাজ করেছে। পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের পক্ষে সাফাই গেয়ে বাঙালি হত্যার সার্টিফিকেট দিয়েছে। গণহত্যার পক্ষে সৌদি সরকারি বক্তব্য পাওয়া যায় ৭ সেপ্টেম্বর। এ দিন পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদি কন্সাল পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং আশা পোষণ করেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অতীতের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।[৩২] আগস্ট পর্যন্ত সৌদি আরবসহ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র বিবৃতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করার কথা বললেও সেপ্টেম্বরের শেষে এবং অক্টোবরের প্রথম থেকে পাকিস্তানকে অস্ত্র সহযোগিতা দেয়ার উদ্যোগ নেয়। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা এর পেছনে কাজ করে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ করলে নিক্সন প্রশাসন গোপনে ইরান, তুরস্ক, জর্ডান, লিবিয়া ও সৌদি আরবের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের কথা চিন্তা করে।[৩৩] দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ সালে ইরানসহ ৫টি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র গণচীনের সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং ৫টি রাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশ চীনের মিত্রে পরিণত হয়, যা যুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করে। সেপ্টেম্বর মাসে ইয়াহিয়া খান ইরান সফর করেন। এ সফরে ইরানের শাহ জেনারেল ইয়াহিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি প্যারিসের *Le Figuro* পত্রিকায় ২৮ সেপ্টেম্বর দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'পূর্ববঙ্গের সঙ্কটে ইরান একশ' ভাগ পাকিস্তানের পক্ষে রয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক। আমরা দু'জন (শাহ ও ইয়াহিয়া) ব্যক্তিগতভাবে খুবই ঘনিষ্ঠ এবং উৎপত্তিগতভাবে উভয় দেশের অধিবাসীরা আর্য বংশোদ্ভূত। ইসলাম ধর্মও আমাদের একত্রিত করেছে।'[৩৪] শাহের এই বক্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবিত হয়েছিল পরের মাসে অর্থাৎ অক্টোবরে। এ মাসে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ৫২টি ফ্যান্টম বিমান পাকিস্তানকে বৈমানিকসহ প্রদান করে।[৩৫] অক্টোবরে ভুট্টোর মিসর সফরের ফলে মিসরও পাকিস্তানের পক্ষে জাতিসংঘে বিবৃতি দেয়। ১০ অক্টোবর মিসর, তুরস্ক ও জর্ডান জাতিসংঘে পাকিস্তানের ব্যাপারে কোনো মীমাংসা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে হওয়া

উচিত বলে জোর দাবি জানায়।[৩৬] ১২ অক্টোবর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাকালে বলেন, পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণরূপে ও নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এ ব্যাপারে কোনো বিদেশি হস্তক্ষেপ জাতিসংঘ সনদের স্পষ্ট লঙ্ঘন। একই সাথে অক্টোবরের মধ্যেই লিবিয়া পাকিস্তানকে বৈমানিকসহ এফ-৫ জেট বিমান প্রদান করে, যেগুলো ছিল আমেরিকার তৈরি। নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন ১৯৭২-এর ২৯ মার্চ এক রিপোর্টে বলেন, এসব জেট এখনো পাকিস্তানে রয়েছে। এগুলোর মার্কিনি চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে এবং পাকিস্তানি বৈমানিকরা এগুলো ব্যবহার করছে।[৩৭] অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের মাধ্যমেও পাকিস্তানকে ৭৫টি জঙ্গি বোমারু বিমান সরবরাহ করে।[৩৮] মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত *জয় বাংলা* পত্রিকার ২৯ অক্টোবর এক রিপোর্টে বলা হয়, বিমানগুলো ইতোমধ্যে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মার্কিন সরকারের ভূমিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ইরান, সৌদি আরব, জর্ডানের মাধ্যমে প্রেরিত মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দেন।[৩৯] অস্ত্র সরবরাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরান, লিবিয়া, সৌদি আরব, জর্ডানকে বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরই ঐ সকল দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। পাকিস্তান এসব দেশের সামরিক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব লাভ করে। মূলত মার্কিন বিমানগুলো ঐসব দেশ থেকে প্রশিক্ষণদানকারী পাকিস্তানি বৈমানিকরাই পাকিস্তানে নিয়ে আসেন।[৪০] ৩ ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে স্থল ও বিমানপথে যুদ্ধ শুরু হলে এ বিমানগুলো পাকিস্তান ব্যবহার করে।

নভেম্বর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং বিভিন্ন এলাকা শত্রুমুক্ত হতে থাকে। সৌদি আরব এ সময়ও পাকিস্তানকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। নভেম্বরে ঈদুল ফেতর উপলক্ষে মক্কা ও মদিনার মসজিদে ঈদের নামাজের মোনাজাতে পাকিস্তানের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।[৪১] ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সৌদি আরবের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ পত্রিকা *আল মদিনার* নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন পাকিস্তান সফরে আসেন। পাক-ভারত যুদ্ধ যখন অত্যাসন্ন এ সময় তাঁর আগমনকে নিছক ব্যক্তিগত সফর বলা চলে না। সৌদি সরকারি মহলে তাঁর ছিল ব্যাপক প্রভাব। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে সৌদি আরব সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে এমন সম্ভাবনা পাকিস্তানে ছিল। সালাহউদ্দিনের আগমন এমন কোনো মিশনের অংশ বলে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য পরিবেশিত হয়। পাকিস্তানে তাঁর দেয়া বিবৃতি থেকে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'হিন্দুস্তানের একথা স্মরণ করা উচিত যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ

গোটা মোছলেম জাহানের বিরুদ্ধে আক্রমণস্বরূপ। সৌদি আরবের জনসাধারণ ও সরকার পূর্ব পাকিস্তান সমস্যাকে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয় বরং সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের সমস্যা বলে মনে করেন।[৪২]

সালেহউদ্দিন এই বক্তব্য দ্বারা ভারতকে হুমকি প্রদান এবং পাক-ভারত যুদ্ধকে একটি ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদের আবরণ দেয়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর পাকিস্তান অবস্থানকালেই ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধকে সৌদি সরকারও সালেহউদ্দিনের মতো ধর্মীয় আবরণ দেয়ার চেষ্টা চালায়। ৬ ডিসেম্বর সৌদি মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা করে যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘের প্রতি উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।[৪৩] ৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে সৌদি দূতাবাসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভারতীয় হামলাকে আন্তর্জাতিক সনদ ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়, পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও ইসলামি আদর্শ ধ্বংস করাই ভারতের উদ্দেশ্য। জাতিসংঘে নিযুক্ত সৌদি স্থায়ী প্রতিনিধি জামিল বারুদি (Jamil Baroody) সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় হামলার নিন্দা করেন।[৪৪]

সরকারের পাশাপাশি সৌদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোও পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। ১৬ ডিসেম্বর মক্কাভিত্তিক সংগঠন (রাবেতা আল আলম) ইসলামি মিশন ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা এবং পাকিস্তানে যোদ্ধা ও অস্ত্র প্রেরণের জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি উদার আহ্বান জানায়।[৪৫] অবশ্য ঐদিনই পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করায় রাবেতার আহ্বানে সাড়া দেয়ার সুযোগ সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশগুলো পায়নি।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সৌদি আরব পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাঙালির বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। এক কোটি বাঙালির শরণার্থী হিসেবে ভারত অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশাও সৌদি আরবকে রেখাপাত করেনি। তবে নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সৌদি আরবে আরবি ভাষী বাঙালি ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র (সৌদি আরব) বাংলাদেশ সরকারকে ৪০০২.৩৭ পাউন্ড দান করেছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের মহাসচিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের ৬৮টি দেশ সম্মিলিতভাবে শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকারকে ৫ লাখ ৭৪ হাজার ১৬২ ডলার সাহায্য দেয়। এসব দেশের মধ্যে ইরাক, ইরান, লিবিয়া, মিসর, ওমানও ছিল।[৪৬]

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির স্বশাসন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও লড়াইয়ের সাফল্য। একাত্তরে বাঙালি জাতি পাকিস্তানের কারণে বাধ্য হয়ে ভারতের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বাঙালি জাতির

সর্বস্তরের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশ। বহির্বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পরাশক্তি, বৃহৎ শক্তি এবং মুসলিম বিশ্ব বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এর প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের জাতীয় স্বার্থ। পরাশক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা থেকে রুশ-ভারতের আধিপত্য বিস্তার রোধ করতে চেয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়া যুদ্ধে ভারতকে সহায়তা দানের মাধ্যমে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রভাববলয় প্রসারিত করতে চেয়েছে।[৪৭] অবশ্য মুসলিম বিশ্বের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য না থাকলেও নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা রুশ-ভারত আধিপত্য বিস্তার রোধের পরিকল্পনায় চীন ও আমেরিকাকে সহযোগিতা দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের পক্ষ যেহেতু পাকিস্তান সেহেতু তাদের দীর্ঘদিনের মিত্র পাকিস্তানকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে গেছে। তাই পাকিস্তানকে সমর্থনের পেছনে ধর্মীয় টানের চেয়ে বরং মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা ইস্যু ও জাতীয় স্বার্থ কাজ করেছে বেশি। সৌদি আরব, জর্ডান, লিবিয়া, ইরানসহ আরব বিশ্বের অনেক দেশের সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনে পাকিস্তানের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাও একাত্তরে পাকিস্তানপন্থি নতজানু নীতি গ্রহণে এসব দেশকে প্রভাবিত করে।

মুক্তিযুদ্ধে আরব বিশ্বের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আরব বিশ্বের দেশগুলো মুক্তিযুদ্ধের মতো স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে জড়িয়ে নিজেদের দেশের জাতীয়তাবাদী ও স্বৈরশাসনবিরোধী তৎপরতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো ঝুঁকি নিতে চায়নি। আর সে কারণে বাঙালি জাতির ওপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা তাদের জাতীয় স্বার্থের কারণেই বালিতে উট পাখির মাথা গোঁজার মতো করে রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরব বিশ্বের ইনফরমেশন গ্যাপ নামক বহুল প্রচারিত গল্পটি প্রকৃতপক্ষে আরব বিশ্বের গা বাঁচানোর জন্য একটি ভ্রান্ত প্রচারণা। মুক্তিযুদ্ধের মতো একাত্তরে ঘটে যাওয়া আন্তর্জাতিক একটি ঘটনা যা আন্তর্জাতিক পর্যায় প্রভাব ফেলেছে, পরাশক্তি হিসেবে চীনের আবির্ভাব ঘটিয়েছে, চীন-মার্কিন সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করেছে, আরব বিশ্বে সোভিয়েত প্রভাবের বদলে চীন-মার্কিন প্রভাব চাঙ্গা করেছে, জাতিসংঘ অনেকদিন পর্যন্ত বিতর্কের ঝড় তুলেছে, যাতে মুসলিম বিশ্বের সদস্যরাও অংশ নিয়েছেন, সেখানে ইনফরমেশন গ্যাপের বিষয়টি মেনে নেয়া যায় না। অন্যদিকে মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন সময় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, ওআইসির ২৫ জুন জেদ্দা সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোকে এবং মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালের ২৬-২৮ মে পর্যন্ত নিউইয়র্কে লিবিয়া, মিসর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করে।[৪৮] মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ভারতসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দেশের দূতাবাস, বহির্বিশ্বের প্রচারমাধ্যমেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কথা। অন্যদিকে

জাতিসংঘের আহ্বানে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো অর্থ দান করেছে। সৌদি আরবের আরবি ভাষী বাঙালি ও প্রবাসী বাঙালিরা যেখানে কষ্টার্জিত অর্থ থেকে চাঁদা তুলে শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পাঠিয়েছেন। সেখানে একই দেশের সরকার (সৌদি আরব) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানতো না তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও এর পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের সৌদি তৎপরতার উল্লেখ করা যায়। অক্টোবর-নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসররা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে দালালদের কেউ কেউ পালিয়ে পাকিস্তান এবং সৌদি আরবে চলে যায়।[৪৭] এ দুটি দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পুনর্বাসিত হয়। সৌদি আরবের এসব দালাল বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং তাদের প্রচারণা ও পাকিস্তানের প্রভাবে সৌদি সরকার শেখ মুজিব শাসনামলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সৌদি স্বীকৃতি মিলেছিল ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরের দিন।[৪৮] মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী অংশের মধ্যে তাই মুসলিম বিশ্বের নিরপেক্ষ ভূমিকা পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের ব্যাপক গণহত্যাকে বহুলাংশ কমিয়ে আনতে পারতো। এতে বাংলাদেশে মুসলিম বিশ্বের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো। যে ভূমিকাটি মিসর ও ইরাক আংশিকভাবে হলেও নেয়ার চেষ্টা করেছিল। সৌদি আরব তথা মুসলিম বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এই ভূমিকার কারণে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি বাঙালির হৃদয়ে ক্ষত হিসেবে বিরাজ করছে। তাই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে একাত্তরে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না।

তথ্যসূত্র :

১. ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, ঘানা, আলজেরিয়া, সিরিয়া, সৌদি আরবের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিক্রিয়া ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিলের বাংলাদেশের *দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তানসহ* বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় এবং পাকিস্তানের *মর্নিং নিউজ, ডনসহ* ইংরেজি ও উর্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের মুসলমান জনগণকে প্রভাবিত করতে এই সংবাদগুলো পত্রিকায় গুরুত্বসহ ছাপা হয়।

২. Denis Wright, *Bangladesh Origins and Indian Ocean Relation (1971-1975)* Dhaka: Academic Publishers, 1988, pp. 223-224 49
প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও মূলনীতি যেমন—গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ১৯৭১ সালের জুনের পর থেকেই প্রচার শুরু করেন। মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলামের জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ৭ ডিসেম্বরের বক্তৃতা, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড* (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২) পৃ. ২৯২-২৯৩

৩. রাও ফরমান আলি (অনুবাদ শাহ আহমদ রেজা) *How Pakistan Got Divided* বইয়ের অনুবাদ, *বাংলাদেশের জন্ম,* ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬। পাকিস্তান সরকারের গভর্নর টিক্কা খানের দপ্তর থেকে প্রচারিত সরকারি প্রচারপত্রে তাজউদ্দীন আহমদকে 'জন্মগতভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করা হয়। মুসলমান নাম গ্রহণ করে তিনি আওয়ামী লীগে ঢুকেছেন— পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় চক্রান্ত সফল করার জন্য এ কথাও বলা হয়। দ্রষ্টব্য আবদুল গাফ্ফর চৌধুরী, *ইতিহাসের রক্ত গোলাপ পনেরই আগস্ট পঁচাত্তর,* ঢাকা : ১৯৯৪

৪. Yitzhak Sichor, *The Middle East in Chinese Foreign Policy 1947-1977,* Cambridge, 1979, P. 167

৫. S.M. Burke, *Paksistan Foreign Policy: A Historical Analysis,* London 1973, P. 204

৬. Hasan Askari Rizvi, *Pakistan: Ideology and Foreign Policy, American Affairs: An American Review*, New York, Spring, 1983, P. 53

৭. *The Sunday Times,* (London) February 3, 1974

৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা,* ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৯। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য- Henry Kissinger, T*he White House Years,* New Delhi, 1979, pp. 698-787

৯. Yitzbak Sichor, *প্রাগুক্ত,* P. 167

১০. *Ibid*, P. 208

১১. *দৈনিক বাংলা,* ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২

১২. *Pakistan Horizon,* Vol. XXIV, No. 2, 1971, pp. 156-157

১৩. *The Times of India,* June, 27, 1971

১৪. *জয় বাংলা* (মুজিবনগর), ২ জুন ১৯৭১

১৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ,* ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮

১৬. Pakistan Horizon, Vol. XXIV, No. 3, 1971, p. 71

১৭. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান', *অগ্রপথিক,* আগস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭

১৮. Tuhfa Zaman, *Bangladesh and Organization of Islamic Conference (1971-1988),* (Unpublished M. Phil Thesis) Delhi: Jawhar Lal Nahru University, 1980, p. 134

১৯. *দৈনিক পাকিস্তান,* ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

২০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮

২১. *National Herald*, June, 30, 1971

২২. S.R. Sharma, *Bangladesh Crisis and Indian Foreign Policy,* New Delhi, 1978, PP 53-54

২৩. *দৈনিক জনপদ,* ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৩

২৪. *দৈনিক পাকিস্তান,* ৩ এপ্রিল ১৯৭১, আরো দ্রষ্টব্য *Morning News*, 3 April, 1971

২৫. *The Pakistan Times* (Karachi), April 9, 1971
২৬. *The Dawn*, April 29, 1971
২৭. *IDSA New Review on Pakistan* (Delhi: IDSA), 1971, April p. 21
২৮. *The Pakistan Observer*, May 15, 19710
২৯. *The Morning News* (Karachi), June 21, 1971
৩০. লিবিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়ার বিবৃতির জন্য দ্রষ্টব্য *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No. 2, 1971, PP. 73, 75, 77, 80, 162-163
৩১. *দৈনিক পাকিস্তান,* ২৭ মে ১৯৭১
৩২. *The Morning News* (Karachi), September 8, 1971
৩৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, প্রাগুক্ত,* পৃ.৫৪
৩৪. *The Dawn,* September 29, 1971
৩৫. *দৈনিক আজাদ,* ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
৩৬. *আনন্দ বাজার পত্রিকা,* ১০ অক্টোবর, ১৯৭১
৩৭. দৈনিক *আজাদ,* ৩১ মার্চ, ১৯৭২
৩৮. *Financial Times,* October 19, 1971
৩৯. *Pakistan Horizon,* Vol. XXV, No.1, 1972, p.177
৪০. দৈনিক *আজাদ,* ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১
৪১. *ঐ*
৪২. *ঐ*
৪৩. Naveed Ahmed, "Pakistan-Saudi Arab" in Verinder Grover and Ranjana Arora, *Political System in Pakistan,* Vol.8, New Delhi, 1995, p.220
৪৪. দৈনিক *পাকিস্তান,* ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১
৪৫. *Pakistan Horizon*, vol. XXV, No.1, 1972, p.72
৪৬. এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান,* ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫২-৫৩
৪৭. স্বাধীনতাবিরোধীদের নেতৃস্থানীয় যেমন— মতিউর রহমান নিজামী (সভাপতি, ইসলামী ছাত্র সংঘ ও খুলনা জেলা আল বদর প্রধান), আশরাফুজ্জামান খান (ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান সহযোগী), মুজিবুর রহমান (কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য), মীর কাশেম আলী (চট্টগ্রাম আল বদর বাহিনী প্রধান), ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (দালাল উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ফরিদ উদ্দিন (ঢাকা জেলা রাজাকার অ্যাডজুটেন্ট), আবদুল জাহের মোহাম্মদ আবু নাসের (আল বদর হাই কমান্ড), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষক ড. মোহর আলী, ড. হাসান জামান সৌদি আরব ও কেউ কেউ বাংলাদেশে সৌদি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন ও আছেন। তাদের তালিকা ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩৮৪-৪৩৩ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়,* ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ.১৭৯-১৯১
৪৮. ২২টি ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭টি রাষ্ট্র শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় স্বীকৃতি দেয়, ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সৌদি আরব ও সুদান, ১৯-২৯ আগস্ট জর্ডান, ইরান ও ইয়েমেন স্বীকৃতি দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য আরব রাষ্ট্র

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। আগস্টে বাহরাইন, সেপ্টেম্বরে কাতার স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে এ দুটি দেশে ১৫০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করে ব্রিটেন এ দুটি দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের প্রভাব সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে এ শূন্যতা পূরণে ইরান, ইরাক নতুনভাবে সৈন্য ও সমরাস্ত্র সমাবেশ ঘটাতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র আরব দেশগুলো পাকিস্তানের সঙ্কটের মতো বাইরের একটি দেশের সঙ্কটে জড়ানোর অবস্থায় ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে বিভিন্নভাবে দেশগুলো প্রতিক্রিয়া দেখায়। মুক্তিযুদ্ধে মধ্যপন্থি কিছু ক্ষুদ্র আরব দেশ মৌন অথবা সীমিত ভূমিকা পালন করে। অবশ্য কোনো কোনো দেশ যে ভূমিকা পালন করে তাতে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ পায়। মুক্তিযুদ্ধে ইরাক, ইয়েমেন, লেবানন, প্যালেস্টাইন, কুয়েত তেমন সক্রিয় না হলেও একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দিলেও ক্রমান্বয়ে তারা মৌন মনোভাব পোষণ করে। এসব দেশের পত্রিকা কখনো কখনো এমন ভূমিকা পালন করে তাতে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ পায়। তবে ব্যতিক্রম ছিল জর্ডান। দেশটি শুধু পাকিস্তানকে সমর্থন নয়, অস্ত্র সরবরাহ করে সহায়তা করে।

ইরাক

ইরাকের মুক্তিযুদ্ধ পাক-ভারত সম্পর্কে মনোভাব ছিল অনেকাংশে রাশিয়ার সঙ্গে তার সুসম্পর্কের প্রতিফলন। অন্যদিকে পাকিস্তানের কট্টর সমর্থক ইরানের কারণেও ইরাক ছিল বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। কমিউনিস্টপন্থি বাথ পার্টির

প্রেসিডেন্ট তাই পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে কোনো বিবৃতি দেননি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৮ এপ্রিল রুশ-ইরাক চুক্তির দ্বারা রাশিয়া ইরাককে ১৬৮ কোটি টাকা ঋণ দেয়।[১] এ চুক্তির পর ২৮ এপ্রিল ইরাক প্রথম পাকিস্তান সঙ্কটে সতর্ক মন্তব্য করে। ঐদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় ইরাকি প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পাকিস্তানের গৃহীত পদক্ষেপ ইরাক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।[২] অবশ্য সংক্ষিপ্ত এই বাণীতে ইরাকি প্রেসিডেন্ট অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁর সরকারের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর ইরাক পাকিস্তানের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখানি। প্রতিবেশী দেশ ইরানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের মতো কোনো কার্যক্রমেও জড়ায়নি।

সিরিয়া

আরব বিশ্বের অন্যতম দেশ সিরিয়া শুরু থেকেই পাকিস্তান সঙ্কটে প্রতিক্রিয়া দেখায়। ২৭ মার্চ সিরিয়ার দৈনিক *আল তাউরা* এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে সামরিক সরকার, সামরিক বাহিনীর অভিযানের সমালোচনা প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর জোর দেয়া হয়।[৩] যদিও সরকারি প্রতিক্রিয়া জানা যায় প্রায় এক মাস পর। ২২ এপ্রিল সিরিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল আল খৈয়ম দামেস্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন খান পন্নীকে (বাঙালি) ডেকে তাঁর সরকারের পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৪] সিরিয়ার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৫ এপ্রিল ও এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের সংহতির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সিরিয়ার পাকিস্তান নীতির ব্যাখ্যা করেন। সিরিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ড. এ. আজিজ। তিনি দেশের নাম উল্লেখ না করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন এবং তার দেশের পাকিস্তানের ঐক্যের পথেও সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সংবাদটি ১১ মে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়। অবশ্য পরের মাসেই ভারতের কৃষিমন্ত্রী ফখরুদ্দীন আলী আহমদ দামেস্ক সফর করলে বাংলাদেশ সঙ্কট আলোচিত হয়। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ শরণার্থী সমস্যা সমাধানে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের আশ্বাস দেন।[৫] এ সফরের পর ভারতের গৃহীত নীতির প্রতি সিরিয়া সরকার পূর্বের ধারণা থেকে সরে আসে। যদিও ৭ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাকালে সিরিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের ঐক্য কামনা করেন।[৬]

সরকার পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও সিরিয়ার গণমাধ্যম পাকিস্তান নীতির শুরু থেকেই সমালোচনা করে। ২২ অক্টোবর *আল সাওয়া* পত্রিকা পূর্ব বাংলার সঙ্কটকে রাজনৈতিক সঙ্কট হিসেবে চিহ্নিত করে। এর সমাধানের মাধ্যমে লাখ লাখ শরণার্থীর দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব বলেও মন্তব্য করা হয়।

পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে সিরিয়া সরকারের আগ্রহ সত্ত্বেও যুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে বাঙালি শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর জোর দেয়। সিরিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিবৃতি ৭ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন, 'The Syrian Arab Republic is very eagar to see that the unity of Pakistan is preserved and that peace in East Pakistan is maintained so as to secure the return of refugees to their homes and to ensure peace and security in that region' পরের দিন জাতিসংঘে লিবিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল হালিম খাদ্দান বলেন, 'পাকিস্তানের ঐক্য বজায় থাকুক সিরিয়া এটাই দেখতে আগ্রহী। সিরিয়া চায় পাকিস্তানে শান্তি বজায় থাকুক, যাতে উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে আসতে পারে।' এ বক্তব্যের মধ্যে পাকিস্তান সরকার সেপ্টেম্বর মাস থেকে পাকিস্তান সমস্যা সমাধানে উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর যে জোর দেয় তার প্রতিফলন ঘটে। এ বক্তব্যটি পাকিস্তানপন্থি হওয়ায় *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকাও ৯ অক্টোবর ১৯৭১ ফলাও করে প্রচার করে। ডিসেম্বরে জাতিসংঘে পাকিস্তান ইস্যু আলোচিত হলেও এতে সিরিয়া জড়িয়ে যায় নি। প্রকৃতপক্ষে আগস্ট মাসে পাকিস্তানের কট্টর সমর্থক জর্ডানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ, উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের কারণে সিরিয়া পাকিস্তান ইস্যুতে তৎপর হয়নি। এছাড়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সদস্য মিসর মে মাসে রাশিয়ার সাথে মৈত্রী চুক্তি করায় পাকিস্তান ইস্যুতে জড়াতে চায়নি।

ইয়েমেন

ইয়েমেন মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিবৃতি দেয়। ১২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট Qadi Abdul Rahim Iryani এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। পাশাপাশি এক বিবৃতিতে তিনি যদি এক অংশের জনগণের অন্য অংশের প্রতি কোনো অভিযোগ থাকে তা শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার অনুরোধ জানান।[৭] ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের এই বিবৃতি ছিল অন্যান্য মুসলিম দেশের সরকারপ্রধানদের দেয়া বিবৃতির চেয়ে গঠনমূলক ও নিরপেক্ষ। অবশ্য এরপর আগস্ট মাসের আগে সরকারি কোনো প্রতিক্রিয়া ইয়েমেন দেখায়নি। ৩০ আগস্ট ভারতে নিযুক্ত ইয়েমেনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কলকাতার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশের সঙ্কটকে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় মানবিক সঙ্কট বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান হওয়া উচিত। পাকিস্তান সরকারের গণহত্যা সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, ভালো পরিস্থিতি থাকলে কেউ

দেশ ত্যাগ করতে চায় না। তাই এর পেছনে কোনো রহস্য অবশ্যই আছে।[৮] তাঁর এ বক্তব্য ও শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে আরব বিশ্বের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যাননি এবং এতো খোলামেলা বক্তব্য দেননি। তাঁর এই মন্তব্য ভারতের পত্রিকাগুলো গুরুত্বসহ প্রকাশ করে। ইয়েমেন ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের পক্ষে কোনো সরাসরি বক্তব্য প্রদানেও বিরত থাকে।

কুয়েত

ইয়েমেনের মতো কুয়েতও পাকিস্তানের অন্ধ ভক্ত ছিল না। কুয়েতে তখন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সঙ্কট চলায় তারা পাকিস্তানের দিকে তেমন দৃষ্টি দেয়নি। যদিও সরকারি প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি সমর্থন দিয়ে বিবৃতি প্রকাশিত হয়। কুয়েতের পত্রিকাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ তেমন গুরুত্ব না পেলেও বেশিরভাগ সংবাদ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে মৌন সমর্থন। *দৈনিক আখবার, আল কুয়েত* এপ্রিলেই এক প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণহত্যা বন্ধের দাবি জানায়।[৯] এরপর কুয়েতের আর কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

আবুধাবি

মুসলিম বিশ্বের দেশ আবুধাবি শুরু থেকে পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেয়। ২৮ এপ্রিল আবুধাবির যুবরাজ শেখ আলী বিন রাশিদ করাচিতে সাংবাদিকদের বলেন, সমগ্র আরব জাহান পাকিস্তানকে তাদের সর্বোত্তম বন্ধু বলে মনে করে। কারণ পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের স্তম্ভস্বরূপ। পাকিস্তানের সঙ্কটকে তিনি সে দেশের নিজস্ব ব্যাপার, তাই এতে ভারতের হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার নেই বলেও মন্তব্য করেন।[১০] অবশ্য ভারতের সঙ্গে আবুধাবিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এরপর আর দেশটি পাকিস্তানের ব্যাপারে তৎপরতা দেখায়নি।

জর্ডান

জর্ডান নিজেই ১৯৭১ সালে অভ্যন্তরীণ কিছু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে সঙ্কটে ছিল। এ সময় প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতিও ঘটে। জুলাই মাসে জর্ডানি বাহিনীর হাতে কয়েকজন ফিলিস্তিনির হত্যাকাণ্ড আরব বিশ্বসহ সর্বত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ত্রিপলিতে ৩০ জুলাই আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিতে সদস্যরা ফিলিস্তিনিদের সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন। ফিলিস্তিনিদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তানকে সংশ্লিষ্ট করে বিভিন্ন প্রতিবেদন তখন প্রকাশিত হয়। স্বয়ং পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত পাকিস্তানকে ফিলিস্তিনি হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও ১ আগস্ট ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতে

বলা হয়, পাকিস্তান শুধু জর্ডানে ট্রেনিং কার্যক্রমে নিয়োজিত। অন্যান্য আরব দেশের মতো শুধু ট্রেনিং বিষয় সংশ্লিষ্ট। অন্য একটি ঘটনা যা জর্ডানে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ২৮ নভেম্বর কায়রোতে আরব প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের এক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে জর্ডানের প্রেসিডেন্ট ওয়াসফি টেল আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ ঘটনার জন্য চার ফিলিস্তিনিকে দায়ী করে বাদশাহ হোসেন এর সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে অন্যান্য আরব দেশকেও সংশ্লিষ্ট করার ইঙ্গিত ছিল। তিনি বলেন, 'Those who fired the bullets as Wasfi are criminals, but the real muderes are those who poisoned their minds, They may Arabs.'[১১] জর্ডানের এমনি সঙ্কটে আরব বিশ্বে একঘরা হলেও পাকিস্তানের ব্যাপারে আরব বিশ্বের সঙ্গে জর্ডান সহমতই পোষণ করেছে।

মে মাসে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও ভারতে গমনকারীদের স্বদেশে ফিরে আসার আহ্বান জানালে জর্ডান এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। পাকিস্তান সরকার দেশে ফিরে আসা বাঙালিদের পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাপী সহায়তার আহ্বান জানায়। জর্ডান এতে সাড়া দিয়ে জুলাই মাসের দিকে ১০ টন সাহায্যসামগ্রী পাঠায়।[১২] এর মধ্যে কম্বল, কাপড়, ওষুধ ছিল। ইতোমধ্যে ৬ মে পাকিস্তানে জর্ডানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ কামাল আল শাফি জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের একটি বাণী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দেন। এ বাণীতে বাদশাহ হোসেন 'পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি'র প্রতি জর্ডান সরকারের সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। জর্ডানি রাষ্ট্রদূত ইয়াহিয়াকে বলেন, 'জর্ডান শুধু নিজের দেশের জন্য নয় বরং আরব বিশ্বের স্বার্থে, ইসলামের শত্রু ইসরাইলের হাত থেকে পবিত্র ভূমি রক্ষার স্বার্থে শক্তিশালী পাকিস্তান কামনা করে।[১৩] ১৭ মে জর্ডানের বাদশাহর বাণীর জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁকে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দেন।[১৪]

এদিকে এপ্রিল-মে মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকার মুসলিম দেশগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত করে বাঙালির প্রতি সহায়তার আহ্বান জানায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এপ্রিলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের বাংলাদেশে পাকিস্তানের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগে পাকিস্তানের ওপর চাপ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। মুজিবনগর সরকার ২৬-২৮ মে পর্যন্ত বিশেষ দূত আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিউইয়র্কে মিসর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, লিবিয়া ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকের দায়িত্ব দেন। তিনি এসব দেশের দূতদের সঙ্গে বৈঠক করলেও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাননি।[১৫] বরং এরপর থেকে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরব, তুরস্ক, জর্ডান, ইরান পাকিস্তানের পক্ষে আরো তৎপর হয়। জুলাই মাসে পাকিস্তানে প্রেরিত জর্ডানি সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান সফর করেন পাক-জর্ডান মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সমিতির চেয়ারম্যান খালেদ আবু হাসান। করাচিতে তিনদিন সফর

শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির জন্য কয়েকটি বিদেশি শক্তি দায়ী।[১৬] তিনি জর্ডানের পাকিস্তানের দেয়া ১০ টন খাদ্য সাহায্য নিয়ে পিন্ডি আসেন। তাঁর সফরের পরই জর্ডানি রাষ্ট্রদূত সৈয়দ কামাল আল শাফি ৫ দিনের বেসরকারি সফরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে আসেন। তিনি এখানে অবস্থানকালে ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সফর শেষে দেশে ফেরার আগে মন্তব্য করেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে পূর্ব পাকিস্তানিরা ইসলামি ভাবধারা ও পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে এবং এর প্রতি জর্ডানেরও সমর্থন রয়েছে।[১৭] তিনি আরো বলেন, 'A strong and unified Pakistan is a source of inspiration for all The Muslim countries.'[১৮] একই সাথে তিনি পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্য রক্ষায় পাকিস্তান সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতি সমর্থন দেন। তিনি তাঁর বাংলাদেশ সফরকালে জনজীবন স্বাভাবিক দেখেছেন। কৃষকদের জমিতে চাষ করতে, শ্রমিকদের কাজ করতেও দেখেছেন। তিনি আরো বলেন, অপপ্রচার ও হস্তক্ষেপের কারণে পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে না।[১৯] জর্ডান রাষ্ট্রদূতের সফরকে ব্যক্তিগত বললেও রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য থেকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন থেকে পরিষ্কার হয়, এটি ছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সফর। জর্ডান ও তুরস্কের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানকে অস্ত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন জর্ডানের রিলিফসামগ্রীর আবরণে হয়তো অস্ত্র ছিল। জুন মাসের শেষ দিকে ২২ সদস্যবিশিষ্ট ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) বৈঠকের পর মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের প্রতি আরো সহানুভূতি জানায়। জর্ডান ও তুরস্ক এ ব্যাপারে বেশি তৎপর হয়। এছাড়া ২১ আগস্ট তেহরানে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকান রাষ্ট্রদূতদের এক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া খানের অংশগ্রহণের পর মুসলিম দেশগুলো তৎপর হয়।

আগস্ট মাসে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি পাকিস্তানসহ মুসলিম দেশগুলোকে পাকিস্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সেপ্টেম্বরে রণাঙ্গনে ব্যাপক যুদ্ধ এবং সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় পাকিস্তানের মিত্রদের উৎকণ্ঠিত করে তোলে। পাকিস্তানের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চিন্তিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের পাকিস্তান সফর বেড়ে যায়। এ মাসে লিবিয়া, ইরানে পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সফর এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার ওমান সফরের পর পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র সহায়তার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলে নিক্সন প্রশাসন গোপনে অক্টোবরে সৌদি আরব, ইরান, জর্ডান, তুরস্ক, লিবিয়ার মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়।[২০] ম্যাকলম ব্রাউন ১৯৭২ সালের ২৯ মার্চ এক রিপোর্টে মার্কিন তৈরি জর্ডানের ১০টি এফ-১০৪ বিমান পাকিস্তানে সরবরাহের তথ্য দেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র রবার্ট মেকলনকি পরবর্তী সময় তা স্বীকার করেন।[২১]

দ্বিপক্ষীয় ছাড়াও জর্ডান ও তুরস্ক অক্টোবর থেকে পাকিস্তানের পক্ষে জাতিসংঘে

সোচ্চার হয়। ১০ অক্টোবর তুরস্ক ও জর্ডান জাতিসংঘে পাকিস্তানের ব্যাপারে যে কোনো মীমাংসা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে হওয়া উচিত বলে জোর দাবি জানায়।[২২] মার্কিন সরকার কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞার কারণে সরাসরি অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ থাকায় ইরান, লিবিয়া, সৌদি আরব, জর্ডানকে বেছে নেয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরই এসব দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক ব্যবস্থাকে জোরদার ও আধুনিকীকরণের জন্য পাকিস্তান প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পায়। মূলত একাত্তরে মার্কিন বিমানগুলো ঐসব দেশ থেকে প্রশিক্ষণদানকারী পাকিস্তানি বৈমানিকরাই পাকিস্তানে নিয়ে আসেন।[২৩] ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ বিমানগুলো পাকিস্তান ব্যবহার করে। জর্ডান সরকার শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে থাকে। এমনকি নভেম্বরে যখন পাকিস্তানি বাহিনী চরমভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখনও ২৫ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়াকে প্রেরিত এক বাণীতে জর্ডানি বাদশাহ পাকিস্তান সঙ্কটে জর্ডানের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।[২৪]

৩ ডিসেম্বর চূড়ান্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম বিশ্ব পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। ইতোমধ্যে জর্ডানের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ ছাড়াও বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হলে জর্ডান সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের অখণ্ডতার ওপর জোর দেয় এবং যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে।[২৫] যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদানকারী ১০৪টি দেশের মধ্যে প্রায় সব মুসলিম দেশই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'পাক-ভারত' যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় জর্ডানি প্রতিনিধি আবারো পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর জোর দেন এবং যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করেন।[২৬] যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাবে জর্ডান, তুরস্কসহ সব মুসলিম দেশ সমর্থন দেয়।

পিএলও

যদিও তখন প্যালেস্টাইনিদের আলাদা ভূখণ্ড হয়নি। পিএলওর অধীনে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। প্যালেস্টাইনিরা নিজেরা মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। তাই বাঙালি নেতৃবৃন্দ আশা করেছিল এ সংগঠনটি অকুণ্ঠভাবে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ব্যক্ত করবে। এছাড়া পাকিস্তানের পশ্চিমা জোটে যোগদান ও মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন বিবেচনায় আনবে। কিন্তু শুরু থেকে পিএলওর ভূমিকা ছিল চমকপ্রদ। বেশিরভাগ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় এবং ইসরাইলের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন থাকায় সংস্থাটিকে শুরুতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী করে তোলে। ১৮ এপ্রিল প্যালেস্টাইনের মুফতি-ই-আজমের সংগঠক আমিনুল হোসাইনী এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন।[২৭] তবে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত পাকিস্তানের পক্ষে কোনো বিবৃতি প্রদান থেকে কৌশলে বিরত থাকেন। জুলাই মাসে একটি ঘটনা অবশ্য পিএলওসহ প্যালেস্টাইনি সব সংগঠনকে পাকিস্তানের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এ মাসে জর্ডান বাহিনী কর্তৃক আল ফাতাহ গেরিলা বাহিনীর কয়েকজনের মৃত্যু দৃশ্যপট পাল্টে দেয়। এ ঘটনার পরপর প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে জর্ডান কড়া ব্যবস্থা নেয়। জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে ১৯ জুলাই ঘোষণা করেন, কোনো প্যালেস্টাইনি নাগরিককে তাঁর দেশে থাকতে দেয়া হবে না। প্রায় ২৩০০ প্যালেস্টাইনিকে আটকও করা হয়। জর্ডান সরকার ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণের যৌক্তিকতা হিসেবে ঘোষণা করে, ফিলিস্তিন গেরিলাদের উত্তর জর্ডানের আর্মি বহরে আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তার জন্য তারা গুলি করে। এতে ২০ জন আর্মির মধ্যে ১৯ জনই মারা যায়। ভাষ্যে বলা হয়, Yasir Arafat the gurrilla leader had formally declared war on the Jordanian haurnment by cabling all his bases that he would attack all his forces stationed on the Jordan-Syria frontier.[২৮] এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জর্ডানে ট্রেনিংয়ে নিযুক্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনেন স্বয়ং ইয়াসির আরাফাত। এতে প্রত্যেক প্যালেস্টাইনিকে জর্ডানের পাশাপাশি পাকিস্তান সেনাদের প্রতিও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পাকিস্তান নিজেদের সাফাই এবং পিএলএর অভিযোগ নাকচ করলেও[২৯] প্যালেস্টাইনিদের মধ্যে তা কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। এই ঘটনায় অন্যান্য আরব রাষ্ট্রও জর্ডানের পাশাপাশি পাকিস্তানের নিন্দা করে। মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদত, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ইরিনি এর নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। তারা ইরাক, সিরিয়া, জর্ডানের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দেন। লিবিয়ার সরকারপ্রধান গাদ্দাফি প্রয়োজনে জর্ডানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থার হুমকি দেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদত জর্ডানের প্রেসিডেন্টকে কসাই বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এর পেছনে মার্কিন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন। আলজেরিয়া জর্ডানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।[৩০]

তথ্যসূত্র

১. *Asia Recorder*, Vol.XVII, No.23, 4-10 June 1971, p.10188

২. *Dawn,* 9 April 1971

৩. *হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র,* ৫ম খণ্ড, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫, পৃ.২৪২

৪. *Pakistan Horizon,* Vol.XXIV, No.2, 1971, p.70

৫. *Times of India,* 2 July 1971

৬. *হাসান হাফিজুর রহমান,* পূর্বোক্ত ১৪ খণ্ড, পৃ.৬৩০

৭. *Dawn*, 13 April 1971

৮. *Ibid*, 8 October1971

৯. *The Hindu,* 31 August 1971

১০. *Kessing Contemporary Archieves*, Vol.XXIV, No.21971

১১. *Ibid,* p.2498012
১২. *দৈনিক পাকিস্তান,* ৮ জুলাই ১৯৭১
১৩. *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No. 2, 1971, p.62-63
১৪. *Ibid*, p.77
১৫. এএস এম সামসুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান,* ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৫, পৃ ৬১৭
১৬. *দৈনিক সংগ্রাম,* ১১ জুলাই ১৯৭১
১৭. *দৈনিক পাকিস্তান,* ২৬ জুলাই ১৯৭১
১৮ *Morning News,* 28 July, 1971
১৯. *Ibid*
২০. *Financial Times,* 19 September 1971
২১. V.B. Kulkarni, *Pakistan Its origin and Relation with India* Dhaka, 1988, p.168
২২. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১১ অক্টোবর ১৯৭১
২৩. *দৈনিক আজাদ,* ৩ ডিসেম্বর ১৯৭০
২৪. ঐ
২৫. হাসান হাফিজুর, পূর্বোক্ত ১৩ খণ্ড, ঢাকা : তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫, পৃ.৯৬৯-৯৭০
২৬. ঐ, পৃ.৯৬৯-৯৭৪
২৭. *IDSA News Review on Pakistan*, April 1971, p.29
২৮. *Pakistan Horizon,* Vol.XXIV, No.2, 1971, p.67
২৯. *Kessing Contemporary Archieves,* Vol.XVIII, 1971-72, p.24770
৩০. *দৈনিক পাকিস্তান,* ২ আগস্ট ১৯৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইরান

রাজতন্ত্রশাসিত ইরানে একদিকে পার্লামেন্ট 'মজলিশ' থাকলেও ১৯২১ সাল থেকে রেজা শাহ পাহলভির একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিজেকে আর্য বংশোদ্ভূত এবং ইরান থেকে আগত ঘোষণা দু'দেশের স্বৈরাচারী শাসককে কাছাকাছি এনে দেয়। ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আরব-ইসরাইল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ওআইসি গঠন এবং এ সংস্থার আওতায় পাকিস্তানের ইরানসহ মুসলিম দেশগুলোর সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব লাভ দেশটিকে ইরানের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। এর তিন বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি নষ্টের আশঙ্কায় শাহ কখনো বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন না— এটা কূটনৈতিক মহল আশা করেছিল। কিন্তু অস্ত্র, প্রকাশ্যে ভারত-রাশিয়াকে হুমকি দেয়ার বিষয়টি অন্য একটি দেশের বিষয়ে ইরানের অতি উৎসাহী মনোভাব হিসেবেই গণ্য হয়েছে। প্রতিবেশী পাকিস্তানের প্রতি ইরানের বন্দর ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ আন্তর্জাতিক রীতিনীতি-বহির্ভূত হলেও শাহ মার্কিন সমর্থনে নির্লজ্জভাবে তা করে যান। বিশেষ করে ডিসেম্বরে পাকিস্তান ইরানের বিমানবন্দর ব্যবহার করে ভারতের বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার শেষ চেষ্টা করে। ইরানের বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব স্বাধীনতার পরও অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান মুজিব আমলে স্বীকৃতি দিলেও ইরান স্বীকৃতি দেয় মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর। বর্তমান প্রবন্ধে দুটি প্রধান দিক আলোচনা করা হয়েছে। **প্রথমত,** ইরানের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ; **দ্বিতীয়ত,** নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ইরান সরকার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা।

ইরানের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের কারণ

ইরান ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ইরান নিজস্ব রাজনীতি, জাতিগত সঙ্কট ও উপসাগরীয় এলাকায় নিজস্ব প্রাধান্যের বিবেচনায় শক্তিশালী পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা কামনা করেছে। উভয় দেশের অভিন্ন স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় তাদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

১. একই জোটের সদস্য : ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তান পঞ্চাশের দশক থেকে পশ্চিমা সামরিক জোটের সদস্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধে গঠিত সকল মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক জোটে উভয় দেশ সদস্য হয়। ১৯৫৪ সালে ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তান বাগদাদ প্যাক্টের সদস্য হয়। পাকিস্তান ও ইরান মার্কিন শিবিরে যোগ দিয়ে বিপুল সামরিক সরঞ্জাম লাভ করে। ইরানের ইরাককেন্দ্রিক ও পাকিস্তানের ভারতকেন্দ্রিক নিরাপত্তাভীতি উভয় দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্রে পরিণত করে। উভয় দেশ মিলে গড়ে তোলে আরসিডি (RCD) সংস্থা। এর ফলে পাকিস্তান ও ইরানের স্বার্থ এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ভাঙনকে ইরান পশ্চিমা জোটের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। ইরান মুক্তিযুদ্ধের সুযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের এ অঞ্চলে শক্তি অর্জন তাই জোটের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। একাত্তরের শেষ নাগাদ সোভিয়েত নৌবাহিনীর উপসাগরীয় এলাকা পরিদর্শন, Umm Qasr-এ সোভিয়েত নৌঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা ইরানকে আরো ভাবিয়ে তোলে। ইরানের শাহ তাই যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় মিত্র পাকিস্তানের ঐক্য ও পাকিস্তানকে সহযোগিতার ওপর জোর দেন।[১]

২. পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতায় ইরানের সহায়তা : ইরান পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে সকল ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নীতিকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭ এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ইরান পাকিস্তানকে সহায়তা দেয়। কাশ্মীর প্রশ্নে জাতিসংঘে সরকারিভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়। ইরান-পাকিস্তান সম্পর্ক ষাটের দশকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯৬৯ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের তেহরান সফর উপলক্ষে এক ভোজসভায় ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান ও ইরানের সীমানাকে নিছক আনুষ্ঠানিকতা ও প্রটোকল এবং দু'দেশকে এক আত্মা হিসেবে অভিহিত করেন।[২]

৩. ইরাককেন্দ্রিক নিরাপত্তা সমস্যা : ইরান ও ইরাকের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। ইরানের সঙ্গে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তেমনি ইরাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। ইরান তখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে, উপসাগরীয় এলাকায় রুশ আধিপত্যের সুযোগে লাভবান হবে তার শত্রু ইরাক। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপসাগরীয় এলাকায় শক্তিশালী নৌবহর ইরানের

পশ্চিমা জোটে যোগদানের প্রধান বিবেচনা ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত মিত্র ইরাকের সহানুভূতিও ইরানকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

৪. জাতিগত সমস্যা : পাকিস্তান ও ইরান উভয় দেশের জাতিগত সমস্যা রয়েছে। দু'দেশের স্বার্থেই পাকিস্তানের ভাঙন রোধ করা প্রয়োজন ছিল। পাখতুনিস্তান আন্দোলন দমনের জন্য উভয় দেশের অভিন্ন নীতি রয়েছে এবং এজন্য একে অপরকে সহায়তা করে আসছে। উভয় দেশই একমত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা বেলুচিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে চাঙ্গা করবে, যার প্রভাব ইরানেও পড়বে। ইরানি বেলুচরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইরানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে।[৩] এছাড়া পাকিস্তানের ভাঙ্গন ইরানের উপসাগরীয় Chahbahar-এ নৌঘাঁটি হুমকির সম্মুখীনের আশঙ্কা ছিল। বেলুচিস্তানের খুব কাছাকাছি নির্মিত এ ঘাঁটিটি বেলুচিস্তানে অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে বাধাগ্রস্ত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন।[৪]

৫. মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র : প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বক্তব্য এবং ৬ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদে কমিউনিস্টপন্থিদের প্রাধান্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইরানকে সন্দিহান করে তোলে। উপদেষ্টা পরিষদে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দু'অংশ, কংগ্রেসের সম্পৃক্ততা উভয় দেশকেই ভাবিয়ে তোলে। তারা নতুন দেশটি স্বাধীন হলে এটি রুশ-ভারত প্রভাবিত হবে সে মতই পোষণ করে।

৬. মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইসরাইলি সমর্থন : ইরানের পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের পেছনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইসরাইলের সমর্থনও কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরাইল সরকার ও পার্লামেন্ট (knesset) এর প্রতি সমর্থন জানায়। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের জন্য ইসরাইলি রেডক্রস কাপড়, খাদ্য পাঠানোর ঘোষণা দেয়।[৫] প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেও পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইসরাইলি সমর্থনের অপপ্রচার চালায়।

৭. ইরানের পাকিস্তানের প্রতি নির্ভরশীলতা : ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইলি আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য সৌদি আরব, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরাক, ইরানসহ কয়েকটি দেশের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের দায়িত্ব পায় পাকিস্তান। ইরানে তখন থেকে প্রচুর পাকিস্তানি প্রশিক্ষক অবস্থান করছিল। পাকিস্তানের সহায়তায় চীন ও মার্কিন অস্ত্রে ইরান সজ্জিত হয়। এর ফলে ইরান পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই নিজ স্বার্থে ইরান পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে থাকবে।

৮. চীনের সঙ্গে সমঝোতা : ১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোতে চৈনিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট ইরান চীনকে স্বীকৃতি দেয়। একই বছর ৮টি মুসলিম দেশ চীনকে স্বীকৃতি দেয়।[৬] দীর্ঘ ২২ বছর ধরে (১৯৪৯-৭১) চীনের বিরোধিতাকারী দেশগুলোর সমর্থন নিয়েই একাত্তরের অক্টোবরে চীন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং জাতিসংঘে চীনের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানপন্থি নীতি সমর্থন করে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বে রাশিয়ার এতোদিনের প্রভাব ক্রমহ্রাসমান হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভারতের প্রতি সমর্থন ও আগস্ট মাসে রুশ-ভারত চুক্তি ইরান ভারত মহাসাগর, মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়।

৯. উভয় দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরশাসন : ইরান একটি রাজতান্ত্রিক শাসিত এবং পাকিস্তান ছিল সেনাশাসিত দেশ। উভয় দেশের শাসন ব্যবস্থার স্বৈরতন্ত্র উভয় শাসককে শ্রেণিগত স্বার্থে ঘনিষ্ঠ করেছে, যার প্রভাব মুক্তিযুদ্ধে ইরানের নীতি গ্রহণে প্রভাব ফেলেছে।

মুক্তিযুদ্ধে ইরানি নীতির বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পর্যায় (মার্চ-অক্টোবর ১৯৭১) : প্রথম পর্যায়ে ইরান বিবৃতি প্রদান, সরকারি পর্যায়ে আলোচনায় পাকিস্তানকে সমর্থন, ইরানের গণমাধ্যম পাকিস্তানের পক্ষে মতামতের মধ্যে নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখে। এ পর্যায়ে রাশিয়া ও ভারতের নিন্দা, কখনো কখনো হুমকিও প্রদান করে। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালিদের ওপর গণহত্যার সূচনার পর থেকে এপ্রিলের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের প্রধান দেশগুলো বাংলাদেশের সঙ্কটকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করে। পাশাপাশি পাকিস্তান সামরিক জান্তার পদক্ষেপের সমর্থন করে বিবৃতি দেয়। ইরান প্রথম থেকেই পাকিস্তানের পক্ষে অতি-উৎসাহী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো দেশের হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানিয়ে ইরান ২৮ মার্চ বিবৃতি দেয়।[৭] পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অংশ[৮] এবং এতে হস্তক্ষেপ না করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো হয়। শুধু ইরান সরকার নয় ইরানের গণমাধ্যমও তৎপর হয়ে ওঠে। ২৯ মার্চ তেহরানের ইংরেজি দৈনিক *কায়হান ইন্টারন্যাশনাল*, *তেহরান জার্নাল* এবং ফার্সি দৈনিক *আয়ান গিয়ান* বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরানি পত্রিকাগুলোই এ সম্পর্কে প্রথম সংবাদ প্রকাশ করে। *কায়হান ইন্টারন্যাশনাল* এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ

করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের 'গৃহযুদ্ধ' একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং পাকিস্তানিদের নিজেদের তা সমাধান করা উচিত। এতে আরো উল্লেখ করা হয়, বহির্দেশীয় হস্তক্ষেপ বরং পাকিস্তানের সঙ্কটকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে। *আয়ান গিয়ান, তেহরান জার্নাল* পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়।[৯]

পরের মাসেও ইরান সরকার একই ধারায় চলতে থাকে। এপ্রিল মাসেই ইরানের সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৭ এপ্রিল লে. জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন ইন্দোনেশিয়ার কনসাল জেনারেল তিনি তাঁর সরকারের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

২১ এপ্রিল তাদের মধ্যে এক বৈঠকে ইরানি কমান্ডার পুনরায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গৃহীত পদক্ষেপকে সমর্থন করেন।[১০] এ মাসের শেষে সিয়েটোর (CEANTO) মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে এক যুক্ত ঘোষণায় ইরান ও তুরস্ক পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে 'রুশ-ভারতীয় হস্তক্ষেপের' নিন্দা করেন।[১১]

মে মাসের মাঝামাঝি ইরানের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী সামীর নেতৃত্বে একটি দল ইসলামাবাদ সফর করে। মূলত আরসিডির সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির তিন দিনব্যাপী অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি আসেন তুর্কি প্রতিনিধি দল নিয়ে। উভয় প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি সমর্থন দেন।

জুন মাসে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যখন যুদ্ধ বিস্তার লাভ করে, তখন ইরান আরো বেশি তৎপর হয়। ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৬ জুন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশি জাহেদী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইরানের শাহের বাণী হস্তান্তর করেন। পরের দিন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. এম. খানের দেয়া ভোজসভায় বক্তৃতাকালে ইরানি মন্ত্রী পাকিস্তান ও ইরানকে একদেশ এবং তাদের স্বার্থ অভিন্ন হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, 'আমরা সব সময় পাকিস্তানি ভাইদের পাশে আছি।'[১২] ১৮ জুন দেশে ফেরার সময় করাচি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি পাকিস্তানের জন্য তাঁর দেশের সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[১৩]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেশে ফেরার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে ৩০ জুন *দৈনিক ইরান, তেহরান জার্নাল* এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পাকিস্তান সরকারের মতের সঙ্গে একমত পোষণ করে এ পত্রিকা দুটি ভারতকে শরণার্থীদের ফিরে আসতে বাধা দেয়ার জন্য দায়ী করে।[১৪]

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে অবহিত করার জন্য প্রথম থেকেই উদ্যোগ নেয়। ২৬-২৮ মে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক, লিবিয়া, মিসর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মুক্তিযুদ্ধের

প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন।[১৫] কিন্তু কট্টরপন্থি দেশগুলোর মনোভাবে এতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং জুনের শেষ সপ্তাহে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) বৈঠক শেষে যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার পূর্ণ সমর্থন দেয়।[১৬] জুলাই-আগস্টে এসে মুসলিম দেশগুলোর পাকিস্তানপন্থি মনোভাব আরো শক্তি সঞ্চয় করে। জুলাই মাসের শুরুতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জেড.এ. ভুট্টোর নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল তেহরান সফর করে। এ সফরকে তিনি ব্যক্তিগত সফর বলে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি সফরে যান। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব এস.এম. খানও ছিলেন। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে যুদ্ধের পক্ষে আরো সক্রিয় করে তোলা। যদিও এ পর্যায় পর্যন্ত ইরান বিবৃতি ও সমর্থনের মধ্যেই তাঁর পাকিস্তানপন্থি নীতি সীমাবদ্ধ রাখে। তবে ইরান যে পাকিস্তানপন্থি নীতিতে আরো সক্রিয় হতে যাচ্ছে তা বিভিন্ন তৎপরতা থেকে প্রতীয়মান হয়। জুন-জুলাই মাসে পাকিস্তান ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ব্যাপক সফর করে *কায়হান ইন্টারন্যাশনালের* সাংবাদিক আমির তাহেরী (Amir Taheri) ২৭, ২৮ জুলাই এবং ১, ২ আগস্ট বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। মূলত জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল ফরমান আলি, আওয়ামী লীগের আত্মসমর্থনকারী এমপিদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ নিবন্ধ রচিত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত একপেশে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি সামরিক জান্তার প্রশংসা, সামরিক বাহিনীর বাঙালির ওপর অভিযানের যৌক্তিকতা এতে তুলে ধরেন। ২৭ জুলাই ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে 'The Reluctient President' শিরোনামে প্রবন্ধে ইয়াহিয়া তাঁর পূর্ব পুরুষদের ইরান থেকে আগত, বাড়িতে ফার্সি ভাষী সর্বোপরি তাঁকে একজন ইরানি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইরান ও পাকিস্তানকে তিনি দু'দেশ নয় বরং দু'দেশ ও এক আত্মা বলে অভিহিত করেন।[১৭]

২৮ জুলাই প্রকাশিত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'Five Views of a Tragedy' এ প্রবন্ধে আমির তাহেরী পাকিস্তানি জেনারেলদের সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা, শেখ মুজিবের স্বাধীনতার স্পৃহা, অসহযোগ আন্দোলন, বাঙালি কর্তৃক বিহারি নিধন তুলে ধরেন।[১৮] তাঁর 'The Decline and fall of Sheikh Mujib' প্রবন্ধে মুজিবের বিচার এবং পাকিস্তান সরকার ও জনগণের মনোভাব তুলে ধরেছেন। যদিও সাংবাদিক তাহেরীর ২ আগস্ট 'The Looming shadow of a hungry gaint' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে পাকিস্তান সঙ্কটের জন্য সামরিক শাসকদের সরাসরি দায়ী করেন। প্রবন্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভারতের সহযোগিতাকে পাকিস্তান কর্তৃক চীনের সহযোগিতায় নকশালদের অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। তিনি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেন।[১৯] পত্রিকাটির পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন ইরানে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইরানের

মধ্যস্থতায় ইন্দিরা-ইয়াহিয়ার মধ্যে বৈঠকের বিষয় আলোচিত হতে থাকে। ঐ মাসের ২১ তারিখে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় পাকিস্তানি মিশন প্রধানদের এক সম্মেলন উদ্বোধন করেন তেহরানে সফরকারী পাকিস্তানি পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ। তাঁর সফরের পর এ বিষয়টি ইরানি কূটনৈতিক মহলে বেশ আলোচিত হয়। একই সাথে কূটনীতিকদের সম্মেলনে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার উপর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব গুরুত্ব দেন।[২০] অবশ্য ১৭ আগস্ট তেহরান সরকার চীনকে স্বীকৃতি প্রদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তকে অনেকে পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন-চীন কূটনীতির নতুন অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন। জুন মাসে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের সফরের পর এই সিদ্ধান্ত ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে ৯ আগস্ট রুশ-ভারত চুক্তি ইরান ও পাকিস্তানকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। নিজেদের নিরাপত্তার বিবেচনা থেকে উভয় দেশ আরো কাছাকাছি আসে। আগস্ট মাস পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল দেশগুলো বিবৃতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের মধ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন অব্যাহত রাখলেও সেপ্টেম্বরে কিছু ঘটনা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের প্রেক্ষাপট রচনা করে। পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকের ব্যাপারেও ইরান উদ্যোগী হয়। পাশাপাশি ইরান সরকারি পর্যায়ে পাকিস্তানকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২৪ আগস্ট ইরানের 'কওমে মিল্লি' উপলক্ষে ঢাকায় ইরানি দূতাবাস এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে নিয়াজি, ইরানের সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ বক্তৃতায় তিনি ইরানকে পাকিস্তানের সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে অভিহিত করেন। কারণ প্রয়োজনের সময় ইরান পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।[২১]

১৪ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজতন্ত্রের ২৫০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দু'দিনের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান তেহরান সফর করেন। পাকিস্তানের ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সময়ে তাঁর এ সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইরানের মধ্যস্থতায় ভারতের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো।[২১] দু'দেশের মধ্যে শীর্ষ পর্যায় একটি বৈঠকের জল্পনা-কল্পনা সম্পর্কে আগস্ট মাসে পাকিস্তান সূত্রে, সেপ্টেম্বর মাসে মুজিব সরকারের 'জয় বাংলা' পত্রিকায় ইঙ্গিত দেয়া হয়। হেনরি কিসিঞ্জারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সমঝোতা উদ্যোগও নেয়া হয়। মার্কিন ও ইরানি এ উদ্যোগ সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও সজাগ ছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাপ্তাহিক *জয় বাংলার* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্টভাবে সমঝোতার ৪টি শর্ত উল্লেখ করেন। ১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি; ২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি; ৩. বাংলাদেশ থেকে সকল পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার ও ৪. বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসলীলার ক্ষতিপূরণ প্রদান।[২২]

যদিও মুজিবনগর সরকার ও ভারত এ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ না দেখানোর কারণে এ বিষয়টি তেমন অগ্রগতি হয়নি। ইয়াহিয়া খানের ইরান সফর যে নিছক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানই না তা পাকিস্তানের সংবাদপত্রের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ১৪ সেপ্টেম্বর *দৈনিক পাকিস্তানসহ* পাকিস্তানের সকল সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ৮ পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্রসহ মোট ১২ পৃষ্ঠা বের করে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশে সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। *দৈনিক পাকিস্তান* ও *টাইমসসহ* বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে ১৭ সেপ্টেম্বর স্বীকার করে, প্রেসিডেন্টের সফর রুটিন সফর ছিল না। ইয়াহিয়া উপমহাদেশের শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে ইরান সফর করেন। যুদ্ধকালীন সময় এই প্রথম তাঁর বিদেশ সফর এই বক্তব্যের গুরুত্ব বহন করে। ইয়াহিয়ার সফরের ফলে পাক-ইরান সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়। ইয়াহিয়া খান এক জাঁকজমক অনুষ্ঠানে ইরানের ১০ বছর বয়স্ক যুবরাজ মোহাম্মদ রেজা খানকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ফ্রন্টিয়ার কোরের প্রথম কর্নেল ইন চিফ পদে অভিষিক্ত করেন।

ইয়াহিয়া খান তাঁর বক্তৃতায় রেজাকে প্রথম কর্নেল ইন চিফ হিসেবে পেয়ে পাকিস্তান গৌরববোধ করছে বলে মন্তব্য[২৩] ইয়াহিয়ার ইরান তোষণনীতির প্রতিফলন ঘটায়।

এ সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ঘোষণায় বাংলাদেশ সমস্যার কোনো উল্লেখ না করে শাহ বরং পাকিস্তানি বাহিনীর কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন দেন। পাকিস্তানকে সমর্থনের আশ্বাসও পুনর্ব্যক্ত করেন।[২৪] শাহের পাকিস্তানপ্রীতির আরো প্রমাণ পাওয়া যায় প্যারিস ভিত্তিক *Le-Figaro* পত্রিকায় ২৮ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাতকার থেকে। তিনি এতে বলেন, Iran was 100 percent behind Pakistan in East Bengal crisis. It is normal. We (Shah and Yahya) are very close personally and without trying to be racist our two people are of Aryan origin united by Islam.[২৫]

সেপ্টেম্বরে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট নুরুল কাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য কাবুল হয়ে তেহরান সফর করেন। তিনি তেহরানে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও ইরানের শাহেনশাহ ও প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোভায়দার, *তেহরান জার্নাল*, *কায়হান ইন্টারন্যাশনাল*-এর সম্পাদককে এক পত্রে বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশ সমস্যা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচার তুলে ধরেন। এখানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি কাজ করেন। যদিও এখানে বাঙালি কূটনীতিকরা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নি।

মুক্তিযুদ্ধে ইরানের নীতির দ্বিতীয় পর্যায় (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর) :

ইয়াহিয়ার সফরের পরপরই মুক্তিযুদ্ধে ইরানের নীতির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ইয়াহিয়ার ইরান সফরকালে অস্ত্র সহযোগিতা সংক্রান্ত কোনো আলোচনার কথা প্রকাশিত না হলেও নয় মাসের যুদ্ধের সময় যেখানে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ সফর পর্যন্ত করেননি, কোনো দেশ সফরে যাননি সেখানে দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁর ইরান সফর সন্দেহের উদ্বেগ করে। অবশ্য পরের মাসেই সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ৫২টি ফ্যান্টম বিমান পাকিস্তানকে বৈমানিকসহ সরবরাহ করে।[২৬] মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র রবার্ট মেকলসকি এর সত্যতা স্বীকার করেন।[২৭] ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ইরান, জর্ডান, লিবিয়া, সৌদি আরবের মাধ্যমে মার্কিন সরকারের অস্ত্র সরবরাহের গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দেন।[২৮] অস্ত্র সরবরাহের জন্য মার্কিন সরকার এ দেশগুলো বেছে নেয়ার কারণ ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর এসব দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য পাকিস্তান প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পায়। ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধে এ বিমানগুলো পাকিস্তান ব্যবহার করে। যুদ্ধে ইরান পাকিস্তানকে সহায়তা করতে সরাসরি এগিয়ে আসে। পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোম্বিংয়ের প্রধান টার্গেট ছিল করাচির তেল ডিপোগুলো। এ সময় ইরান পাকিস্তানি বিমানগুলোর পাহারার দায়িত্ব নেয়। যে কোনো প্রয়োজনে ইরান বিমান ঘাঁটিগুলো ব্যবহার এবং পাকিস্তানের বিমানের যেকোনো সরবরাহের জন্য ইরানি সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। করাচি বন্দর আক্রমণের শিকার হলে ইরানের ঘাঁটি জাহেদানের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে।[২৯] অক্টোবরে মার্কিন বিমান ছাড়াও ইরানের মাধ্যমে পশ্চিম জার্মানি পাকিস্তানকে দেয় ৯০টি এফ ৮৬ স্যাবর জেট, ৬টি আলুম এ-৩ হেলিকপ্টার, ২৪টি মিরাজও, ৩টি ফাইটার, ৩টি ডুবোজাহাজ। ইরান নিজে দেয় ২৪টি লকহীড সি ১৩০ হারকিলাস পরিবহন।[৩০]

৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান অস্ত্র ছাড়াও জাতিসংঘে সমর্থন আদায়ে পদক্ষেপ নেয়। যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিয়ে ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতি বিষয় উত্থাপিত হয়। ঐদিন আলোচনাকালে লেবানন, জর্ডান, ইরান, সৌদি আরব পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর জোর দেয় এবং যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে।[৩১] যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ইরানসহ সকল মুসলিম দেশ ভোট দেয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের অবসান ঘটে।

এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইরান পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান ও ইরানের রাষ্ট্রীয় নীতিতে স্বৈরতন্ত্র, সামরিক দিক দিয়ে ইরানের পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীলতা, ইরানের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ইরানকে এই নীতি অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত

করে। তাই বলা যায় পাকিস্তানের সমর্থনের পেছনে ধর্মীয় চেতনার চেয়ে বরং ইরানের নিরাপত্তা ইস্যু ও জাতীয় স্বার্থ অধিক ভূমিকা রাখে। ভারত সরকার, মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইরানকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা যায় নি। বরং মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসে মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলে অক্টোবর মাস থেকে নিক্সন প্রশাসন ইরানসহ সৌদি আরব, জর্ডান, তুরস্ক ও লিবিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে।[৩২] ইরানের পাকিস্তানপন্থি নীতি শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়ই নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও অব্যাহত থাকে। ইরান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর।

অথচ মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু দুটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল সেখানে ইরানসহ মুসলিম বিশ্বের নিরপেক্ষ ভূমিকা পাকিস্তান সামরিক জান্তার গণহত্যাকে বহুলাংশে কমিয়ে আনতে পারতো। অথচ শুধু সমর্থন নয় পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে ইরান এ হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করে। ইরানের এ ভূমিকার কারণে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় নেয়।

তথ্যসূত্র :

১. *Kayhan International* (Tehran), 25 October 1973
২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ নভেম্বর ১৯৬৯
৩. Zubeida Mustafa. 'Recent Trends in Pakistan Foreign Policy: The Middle East Factor,' *Pakistan Horizon,* Vol.XXVII, No. 4, 1975, p.102
৪. *Ibid.*
৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক কারণে বঙ্গবন্ধুর অবদান', *মাসিক অগ্রপথিক*, আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৩৮
৬. Yitzhak Sichor, *The Middle East in Chinese Foreign policy 1947-1977* Cambridge, 1979, p. 169
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ১৯৭১
৮. *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No. 2, 1971, p. 70. আরো দ্রষ্টব্য : *Morning News*, (Dacca), 3 April, 1971
৯. উদ্ধৃত, *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১
১০. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭১
১১. *Times of India*, 27 June, 1971
১২. *The Pakistan Times*, 18 June 1971
১৩. *The Dawn*, 19 June 1971
১৪. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ জুলাই ১৯৭১। শরণার্থী সংখ্যা তখন ছিল প্রায় ৯০ লাখ। দ্রষ্টব্য, *Kessing Contemporary Archives*, 18-25 December, 1971, p. 24990

১৫. এ.এস.এম. শামসুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৫), পৃ. ৬২৭
১৬. *Pakistan Times*, 27 June 1971
১৭. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১৪ খ, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫, পৃ. ৫৮৯-৫৯০
১৮. দ্রষ্টব্য, *ঐ*, পৃ. ৫৯০-৫৯৬
১৯. দ্রষ্টব্য, *ঐ*, পৃ. ৬০৩
২০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২২ আগস্ট ১৯৭১
২১. *Pakistan Times*, 23 October 1971
২২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের তারিখ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), ৪৯ যদিও পাকিস্তানের সমঝোতা ফর্মুলায় বাংলাদেশকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রস্তাব ছিল
২৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২৪. *জয় বাংলা*, সংখ্যা ২০, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। আরো দ্রষ্টব্য, *Pakistan Horizon*, Vol. XIV, No. 4, 1971, p. 69
২৫. *The Dawn*, 29 September 1971
২৬. *দৈনিক আজাদ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১
২৭. V.B. Kulkarni, *Pakistan its Origin and Relations with India*, Dhaka,1988, p. 118
২৮. *Pakistan Horizon*, Vol. XXV, No. 1, 1972, p. 177
২৯. *Iran News and Document* (New Delhi) 14 May 1973
৩০. আবু সাঈয়িদ, *ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, ঢাকা: ১৯৮৮, পৃ. ৪২
৩১. দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৯৬৯-৯৭৪
৩২. *Financial Times* (London), 16 October 1971

স প্ত ম অ ধ্যা য়

তুরস্ক

ইউরেশিয়ার দেশ তুরস্ক এককালে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৭১ সালে বিশ্বরাজনীতিতে সে অবস্থা না থাকলেও তুরস্ক মুসলিম বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমা জোট বাগদাদ প্যাক্টের স্বাক্ষরদাতা দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ও তুরস্ক উল্লেখযোগ্য। এরপর তুরস্ক শুধু জোটের সদস্যই নয়, সকল বিষয়ে সহমত পোষণকারী। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণকারী দেশগুলোর অন্যতম ছিল তুরস্ক। পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের মিত্র তুরস্ক এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নেয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তুরস্ক পাকিস্তানের পক্ষে তৎপর ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইটের' আওতায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণহত্যা শুরু করে এবং একে বৈধতা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সঙ্কটকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ' সমস্যা বলে চিহ্নিত করে। তুরস্ক পাকিস্তানের এ নীতিকে সমর্থন দেয়। ৩ এপ্রিল তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারি প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান বাহিনীর বিশৃঙ্খলা দমনে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানায়।[১] এপ্রিল মাসের শুরুতে তুর্কি নৌবাহিনীর প্রধান সেলাল ঈচিগলু (Celal Eycieoglu) এবং বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল মহসিন বাতুর (Muhsin Batur) পিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। তাঁদের পাকিস্তান সফর ও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক ফলাও করে পত্রিকাগুলো প্রকাশ করে। যুদ্ধের এ সময় তুর্কি দু'জন শীর্ষ সামরিক নেতার পাকিস্তান সফরের মধ্য দিয়ে তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তানের বোঝাপড়া সহজ হয়। এপ্রিলের শেষ নাগাদ ইরান ও তুরস্ক CENTO[২]-এর মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে পাকিস্তান সঙ্কট গুরুত্বসহ আলোচনা শেষে যুক্ত ঘোষণায় ভারতকে উদ্দেশ করে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের

বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের নিন্দা করে।[৩]

মে মাস থেকে পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বে নিজের অবস্থানকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমনকারী শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার আহ্বান ছাড়াও বিদ্রোহী বাঙালিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়। তুরস্কসহ মুসলিম দেশগুলো এর প্রতি সমর্থন জানায়। পরের মাসে জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তুরস্ক যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে কম্বল, বস্ত্র, ওষুধসহ একটি বিমানভর্তি রিলিফ সামগ্রী বাংলাদেশে পাঠায়।[৪] এই রিলিফ সামগ্রী বাঙালিদের জন্য আনা হলেও তাদের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে সামরিক বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারসহ স্বাধীনতাবিরোধী মিলিশিয়াদের জন্য ব্যবহার করা হয়।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটি পার্লামেন্টারি দল কাশিম গুলকের নেতৃত্বে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁরা চুয়াডাঙ্গা, চট্টগ্রাম সফর করে দেশটিতে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে পাকিস্তানের পক্ষে সাফাই গান। চুয়াডাঙ্গায় ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের সম্পর্কে মন্তব্য থেকে মনে হয় আসলে তাঁর কণ্ঠে পাকিস্তান সরকারেরই ভাষ্য শোনা যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'A family who had just arrived at the reception centre told Turkish MP's that they had gone over to India out of fear and panic created by the miscreants and the Indian propaganda. They all looked relieved and happy to be back in Pakistan.'[৫] ২৩ জুলাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর যে মন্তব্য করেন তাতে তুরস্কের পাকিস্তানপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কোনো দেশের ঐক্যের জাতীয় গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি এবং বিচ্ছিন্নতার প্রচেষ্টাকে দমন করতেই হবে। তিনি এখানে বলেন, পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্কটে তুর্কি জনগণকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দুর্ভাগ্যজনক প্রচেষ্টাকে কোনো আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন রাষ্ট্র বরদাশত করতে পারে না। মন্ত্রীর এই মন্তব্য দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা ২৪ জুলাই ফলাও করে প্রচার করে।

তিনি ২৪ জুলাই পিন্ডিতে, পশ্চিমা প্রেস পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনা করে যে মন্তব্য করেছে তা যথার্থ নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি পাকিস্তান সামরিক অভিযানকে যথার্থ বলেও সমর্থন করেন। ভারত জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ পদক্ষেপের সমালোচনা করলেও পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি একে স্বাগত জানান। তিনি ভারতের সমালোচনা করেন।

পাকিস্তান সফরকালে তাঁর দলটি প্রেসিডেন্ট টিক্কা খান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। ২৯ জুলাই করাচিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যে মন্তব্য করেন তাতে পরিপূর্ণভাবে তাঁর পাকিস্তানপন্থি মনোভাব ফুটে ওঠে। সব পত্রিকা তাঁর মন্তব্য পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি শিরোনামে প্রকাশ করে। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, 'তখনকার (পূর্ব পাকিস্তান) জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন হইতে চায় নাই

এবং দেশের সংহতির প্রতি এই হুমকি গুটিকয়েক লোকের নিকট হইতে আসিয়াছে। বিচ্ছিন্নতার সহিত যেহেতু দেশের সংহতির প্রশ্ন জড়িত যেহেতু ইহাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করা হয় এবং সেইভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এছাড়া অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগ তিনি ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেন।

আগস্ট মাসে রুশ-ভারত চুক্তিতে সব মুসলিম দেশ পাকিস্তানের পক্ষে আরো সোচ্চার হয়। সরকারি পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারের প্রতি সমর্থন ছাড়াও জাতিসংঘে তুরস্ক পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ায়। ৮ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওসমান ওলক পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্য রক্ষায় তাঁর দেশের সমর্থনের পক্ষে মত দেন।[৬] ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি পাঠায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে ২৮ নভেম্বর তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তান সফর করেন। সফরের শেষে ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে তুরস্ক আন্তর্জাতিক সমাজকে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ, পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পাকিস্তানি এলাকা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের প্রভাব খাটানোর আহ্বান জানান।[৭] ঐদিন পাকিস্তানের টেলিভিশন থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রচার করে। তিনি বলেন, তিনি নিজেও তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রী নিহাত এরিম পাকিস্তানের অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, রক্তপাত বন্ধ, পাকিস্তানের সীমান্ত লঙ্ঘন বন্ধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের অবসানের পক্ষপাতী।[৮]

তথ্যসূত্র :

১ *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No.2, 1971, p.62

২ পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ১৯৫৯ সালে স্বাক্ষর হয়

৩ *Times of India*, 27 April, 1971

৪ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন ১৯৭১

৫ *The Dawn*, 25 July, 1971

৬ *দৈনিক আজাদ*, ৩০ জুলাই, ১৯৭১

৭ *Pakistan Times*, 8 October, 1971

৮ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭১

৯ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

অষ্টম অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

আফ্রিকা মহাদেশের ৫৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি মুসলিম রাষ্ট্র। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জাতি ও ভাষাগত সংঘাত, ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থান, বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ, সীমান্ত সমস্যা ইত্যাদি সঙ্কট থাকায় এসব দেশের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে তেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। ব্যতিক্রম ছিল মিসর ও লিবিয়া। এ দুটি দেশের সরকার ও গণমাধ্যম শুরু থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এর মধ্যে মিসর কিছুটা বাংলাদেশ ইস্যুতে সহানুভূতিশীল হলেও লিবিয়া ছিল পাকিস্তানের কট্টর সমর্থক। মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন সময় আফ্রিকার দেশ সফর করে পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে আফ্রিকার দেশগুলোর সমর্থনের জন্য ফ্রান্সে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এস. কে দেহলভীর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল আফ্রিকার চাঁদ, ক্যামেরুন, ডাহোমি, টেগো, আইভরিকোস্ট, আপারভোল্টা সফর করেন। ইতোমধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মীর খান সেনেগাল, গায়েনা, মালি, মৌরিতানিয়া, নাইজার সফর করেন। এসব দেশের কাছ থেকে সমর্থনের কথা পাকিস্তান ফলাও করে প্রচার করে। আফ্রিকার রাজনীতিতে এসব দেশ নেতৃস্থানীয় না হলেও পাকিস্তান সরকার এ দেশগুলোর পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের প্রতি সমর্থনের কথা ফলাও করে প্রচার করে। মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফ্রিকান দেশগুলো মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মৌন থাকলেও ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘে বাংলাদেশ ইস্যু আলোচিত হলে সকল দেশই যুদ্ধবিরতির পক্ষে মত দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মিসর, লিবিয়া, সুদান, ঘানা, মরক্কো ও অন্যান্য আফ্রিকান মুসলিম দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে।

মিসর

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে মিসর বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, পাকিস্তানের আরব বিশ্বের স্বার্থবিরোধী পশ্চিমা সামরিক জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাকিস্তান নীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যদিও মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মিসরের সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের পক্ষে। ১৯৭০ সালে মিসরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, রুশপন্থি সরকারের বদলে পশ্চিমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নাসের সরকারের ক্ষমতা গ্রহণে নতুন সরকার অন্য দেশের সঙ্কটে সরাসরি জড়াতে চায়নি। যদিও তাদের বক্তব্যে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বাঙালির প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যও কখনো কখনো প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ কায়রো রেডিও এক সংবাদে পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি প্রথম সমর্থন জানায়।[১] একই দিন সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী ইব্রাহিম তাহাওয়াই পাকিস্তানের অখণ্ডতা কামনা করে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, একমাত্র ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী পাকিস্তানই বিশ্বে মুসলিম স্বার্থে বিরাট অবদান রাখতে পারে।[২]

মিসরের প্রভাবশালী পত্রিকা *আল আহরাম*, *সাপ্তাহিক রোজ*, *আল ইউসেফ* মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হলেও *লা জার্নাল ডি ইজিপ্ত* ছিল পাকিস্তানের অন্ধ সমর্থক। শেষোক্ত পত্রিকাটির ১৪ এপ্রিল সংখ্যায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তজেনারেল ইয়াহিয়া খানের ২৫ মার্চ থেকে পরিচালিত সামরিক অভিযানের সমর্থন এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় তাঁর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে।[৩] সাদত সরকার ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সঙ্কটের কারণে অন্য দেশের সঙ্কটে জড়াতে চায়নি। মধ্য মে মাসে ভাইস প্রেসিডেন্ট আলি সারবীর পদচ্যুতি, আরো ৫ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ ও অন্তরীণ সরকারের অবস্থান নাজুক করে দেয়। ৭ জুন আল আহরামে প্রকাশিত শাওকি মোস্তফার লেখা এক প্রবন্ধে মিসর সরকারের পাকিস্তান নীতির প্রতিফলন ঘটে। প্রবন্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে দুই লাখ লোকের মৃত্যু ও ৪০ লাখ শরণার্থীর ভারত পলায়ন, আওয়ামী লীগের প্রতি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়। যদিও শেষে বলা হয়, দেশের অংশবিশেষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জনসমর্থনকে ব্যবহার করলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।[৪] এই বক্তব্যে পাকিস্তান সরকারের ঐক্যের প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও বাঙালির আন্দোলনের প্রতি মিসরের সচেতনতার বিষয়টিও ফুটে ওঠে। *সাপ্তাহিক* রোজ, *আল ইউসেফ* ১২ জুন এক প্রবন্ধে ৬০ লাখ বাঙালি শরণার্থীর ভারতে আশ্রয়কে দেশের সঙ্কটের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। পত্রিকাটি পাশাপাশি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তি, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমাহীন বৈষম্যকে বর্তমান সঙ্কটের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। পত্রিকাটি জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতারও সমালোচনা করে।[৫]

তবে একাত্তরের মে-জুন মাসে মিসরের বাংলাদেশের প্রতি নীতি অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ভারত কিছু উদ্যোগ নেয়। মে মাসের মাঝামাঝি মিসরে সরকারি এক সফরে যান ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি মিসরের সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেও প্রেসিডেন্ট সাদাত তাকে সাক্ষাৎ দেননি। অবশ্য সাদতের এ সিদ্ধান্তকে পাকিস্তান সরকার প্রশংসা করে *দৈনিক পাকিস্তান* ১৬ জুন ১৯৭১ বড় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যদিও এ ঘটনার পেছনে মিসর সরকারের ভারতের প্রতি বৈরিতার প্রমাণ দেয় না। এ সময় নতুন ঘোষিত ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সংবিধান প্রণয়ন, নতুন সরকারের পুনর্গঠন নিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদত ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া জয়প্রকাশ নারায়ণের এ সফর বেসরকারি সফর ছিল। তবে এ সময় পাকিস্তান নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল মোজাফফর হাসানের কায়রো সফর এ ঘটনায় প্রভাব ফেলতে পারে। ১৪ জুন সাদত ও মোজাফফরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাদত পাকিস্তানের সংহতির প্রতি মিসরের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন।[৬] *দৈনিক পাকিস্তান* পাকিস্তানের সংহতির প্রতি মিসরের সমর্থন শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। যদিও ২৫-২৮ মে রুশ প্রেসিডেন্ট পদগর্নির মিসর সফর এবং ২৭ মে ১৫ বছর মেয়াদি রুশ-মিসর চুক্তি মুক্তিযুদ্ধেও ভারতের প্রতি মিসরের নীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদিও সফরকালে যুক্ত ঘোষণায় দক্ষিণ এশিয়ার বিষয় তেমন কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার শান্তির জন্য তারা ঐক্যমত পোষণ করেন।[৭] এরপর জুনে ভারতের কৃষিমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদের কায়রো ও সিরিয়া সফরও ভারতের প্রতি মিসরের নীতিতে পরিবর্তন ঘটায়।[৮]

তবে আগস্ট মাসে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর মিসরের পত্রপত্রিকা আগের চেয়ে বাংলাদেশপন্থি মতামত প্রকাশ করে। যদিও সরকার পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সমর্থন না করলেও সরকার অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতর সমাধান চেয়েছে। অন্যান্য কট্টরপন্থি মুসলিম দেশগুলোর মতো সামরিক হস্তক্ষেপের সমর্থনও দেয়নি। আগস্ট মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিচার শুরুর ঘোষণা দিলে *আল আহরাম* পত্রিকা এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। ১০ আগস্ট এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, সামরিক অথবা গোপন বিচার দ্বারা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।[৯] আরব লীগের প্রাক্তন নয়াদিল্লিস্থ প্রতিনিধি এবং *আল আহরামের* সিনিয়র সম্পাদক ক্লোভিস মাকসুদ ২০ সেপ্টেম্বর মুজিবের মুক্তির জন্য জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। জাতিসংঘে ৮ অক্টোবর মিসরের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ রিয়াদ বক্তৃতা দেন। এখানে বক্তৃতায় তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, পাকিস্তান এমনভাবে সঙ্কট দূর করবে যাতে দেশের ঐক্য বজায় থাকে। তাঁর এ বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতে মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* ৯ অক্টোবর ফলাও করে প্রচার করে। পরের দিনই মিসরের প্রেসিডেন্ট

রাশিয়া সফর করেন। ১০-১৩ অক্টোবর আনোয়ার সাদত রাশিয়ায় সফর করেন। তাঁর সফরকালে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। সাদতের এই সফরের পরই পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জেড. এ. ভুট্টো, এম.এন.এ. গোলাম মোস্তফা জাতুইসহ ২৩ অক্টোবর তিন দিনের সফরে মিসর উপস্থিত হন। তবে মিসরের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ রিয়াদ আশাবাদ ব্যক্ত করেন, খুব শিগগিরই পাকিস্তান সঙ্কট কেটে গিয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যুদ্ধ শুরু হলে মিসরের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার জন্য এটি ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি মিশন। যদিও এই সফরের বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাকিস্তান বা মিসরীয় উৎস থেকে জানা যায় না। তাই এই মিশন খুব একটা সফল হয়েছিল বলা যায় না। ভুট্টোর সফরের পর মিসরে পাকিস্তানি নতুন রাষ্ট্রদূত আসলাম মালিক পরিচয়পত্র পেশ করেন। ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে জাতিসংঘে উত্থাপিত যুদ্ধবিরতির সব উদ্যোগের সাথে মিসর সহমত প্রকাশ করে একে সমর্থন জানায়।

লিবিয়া

লিবিয়া শুরু থেকেই পাকিস্তানপন্থি অবস্থান নেয়। যুদ্ধে সমর্থন ছাড়াও অক্টোবর থেকে পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করে। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল পাকিস্তান সঙ্কট নিয়ে লিবিয়া প্রথম বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে লিবিয়া সরকার বাংলাদেশ সঙ্কটকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা' এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গৃহীত পদক্ষেপকে সমর্থন দেয়। একই দিন লিবিয়ার *দৈনিক আল হুরিয়াত (Al-Huriyat)* মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের নিন্দা করে।[১০] লিবিয়ার অন্য একটি পত্রিকা *Al Hakika* মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর কাছে পাকিস্তানের দ্বিধাবিভক্তির ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানায়। একই সাথে *Al Qadera* পত্রিকার এক নিবন্ধে পাকিস্তানের সমস্যার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ভারতকে দায়ী করা হয়।[১১] পরের দিন *লিবিয়া টাইমস* এক প্রতিবেদনে প্রত্যেক আরব পত্রিকা পাকিস্তানি জাতিকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টাকে নিন্দা জানায় বলে মন্তব্য করে। ১০ এপ্রিল দৈনিক আল হুরিয়াতের এক নিবন্ধে আরো নগ্নভাবে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এতে বলা হয়— We give our Arab Muslim support to those who are striving to keep Pakistan unified. We supported Mujib in his just demand but when he claimed separation and sought to destroy the unity of the country, we have no option but to stand against the scecessionist ideas and support the government in any action necessary to preserve the unity of Pakistan.[১২]

মে মাস থেকে লিবিয়া সরকার পাকিস্তানের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ১ মে লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফি ত্রিপোলিতে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবদুর রউফ খানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ঐক্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি একই সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকেও ডেকে ভারত সরকারকে পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানান।[১৩] ২৬-২৮ মে পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্কে লিবিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করলেও[১৪] লিবিয়ার সরকারি মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং আগস্টের শেষ দিকে পাকিস্তানে নিযুক্ত লিবিয়ান রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম আলী আল জাবরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনে পাকিস্তানের গৃহীত সকল পদক্ষেপে তাঁর সরকারের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সংবাদটি দৈনিক সংগ্রাম ২ সেপ্টেম্বর বড় করে প্রচার করে।

মে-জুন মাস থেকে মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলে নিক্সন প্রশাসন গোপনে সৌদি আরব, ইরান, জর্ডান, তুরস্ক ও লিবিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়।[১৫] লিবিয়া পাকিস্তানকে আমেরিকার তৈরি এফ-৫ জেট বিমান সরবরাহ করে, নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা ম্যালকম ব্রাউন ১৯৭২ সালের ২৯ মার্চ এক রিপোর্টে এ তথ্য ফাঁস করেন।[১৬] এছাড়া লিবিয়ার মাধ্যমে আমেরিকান বিমান সরবরাহ পরবর্তীকালে মার্কিন দলিলপত্রে এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন মুখপাত্র রবার্ট মেকলসকি (Robert Mccloskey) স্বীকার করেন।[১৭] অক্টোবর মাসে আগত এই মার্কিন সরবরাহের ফলে পাকিস্তান সমরাস্ত্রের দিক দিয়ে শক্তিশালী হয় এবং ভারতের সঙ্গে পরের মাসেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মার্কিন সরকারের লিবিয়ার মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের গোপন তথ্য ফাঁস করেন।[১৮] অস্ত্র সরবরাহের জন্য মার্কিন সরকারের ইরান, লিবিয়া, সৌদি আরব, জর্ডানকে বেছে নেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর এসব দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক ব্যবস্থাকে জোরদার ও আধুনিকীকরণের জন্য পাকিস্তান প্রশিক্ষণের দায়িত্ব লাভ করে। মূলত একাত্তরে মার্কিন বিমানগুলো এসব এলাকা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী পাকিস্তানি বৈমানিকরাই পাকিস্তানে নিয়ে আসেন।[১৯] ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধে এ বিমানগুলো পাকিস্তান ব্যবহার করে।

ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘে লিবিয়া পাকিস্তানকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাক-ভারত পরিস্থিতি আলোচনাকালে লিবিয়াও অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর জোর দেয় এবং যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে।[২০] যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট

প্রদানকারী ১০৪ জনের মধ্যে প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধ চলাকালে গাদ্দাফি আবারো ভারতকে আগ্রাসী অভিহিত করে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আহ্বান জানান।[২১] ১১ ডিসেম্বর তিনি সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে দেয়া পত্রে তাঁর সরকারের পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।[২২] ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া এক পত্রে গাদ্দাফি ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন।[২৩] ১৬ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া লিবিয়ার প্রতিনিধির একটি চিঠি থেকে দেশগুলোর পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ সমর্থনের প্রমাণ মেলে। এতে ভারতে শরণার্থীদের আশ্রয়দানকে ভারতের পূর্বপরিকল্পিত আগ্রাসন ও পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরির প্রচেষ্টা বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, যদি পাকিস্তানের দ্বিধাবিভক্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে একটি দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও প্রকাশ্য অভিযানের সুযোগ পাবে।[২৪] অবশ্য এ পত্রটি পৌঁছার দিনই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

সুদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সুদান সরকার প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। সুদানে কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত শক্ত ভিত ছিল। একটি হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালে ১৪ লাখ লোকের মধ্যে পায় এক লাখ লোক ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত।[২৫] জেনারেল জাফর আল নিমেরী ১৯৭১ সালের ২৫ মে প্রধানমন্ত্রী ও বিপ্লবী কমান্ডার কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হলে অভ্যন্তরীণ কারণে সুদান পাকিস্তানের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যান্য মুসলিম দেশ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করলেও সুদান সরকার ছিল ব্যতিক্রম। অবশ্য এ সময় দেশটিতে অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানজনিত রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণে পাকিস্তানের বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখায় নি। তবে সুদানের দৈনিক পত্রিকা *আল সাহাফা* ৫ এপ্রিল এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য ও এর প্রেক্ষিতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আকাঙ্ক্ষার সমর্থন করে।[২৬] সুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের বাঙালি অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ক্ষুদ্র হলেও একটি গ্রুপ তৎপরতা দেখায়।[২৭] তাঁদের উদ্যোগে সুদানি পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে কিছু লেখা বের হয়। যদিও তখনো পর্যন্ত সুদানের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কারণে সরকার এতে যুক্ত হয়নি। সুদানের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— প্রথমত, এসময় দক্ষিণের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের মুসলমানদের চরম সংঘর্ষে প্রায় এক লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের অর্থনীতিতেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যদিও জেনারেল নিমেরির নেতৃত্বে উত্তর-দক্ষিণের ধর্মীয় সংঘাত দূর হয়, তারপরও দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের আশঙ্কায় তাঁর সরকার আন্তর্জাতিক ইস্যুতে

বিবৃতি প্রদানে বিরত থাকেন। দ্বিতীয়ত, সুদানের প্রতিবেশী দেশ লিবিয়ার কট্টর পাকিস্তানপন্থি নীতি—অবস্থান দুর্বল সুদানকে পাকিস্তান সঙ্কটে জড়ানো থেকে বিরত রাখে। যদিও ১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলেও জেনারেল জাফর আল নিমেরি লিবিয়ার প্রস্তাবিত কোনো রিপাবলিক বা জোটে যোগ দেননি। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সুদানের প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা নিমেরি পদচ্যুত হলে এর পেছনে লিবিয়ার সমর্থন রয়েছে বলেও তিনি মনে করতেন। যদিও ২২ জুন তিনি পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পান এবং ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকেন। গাদ্দাফি যেহেতু পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং পাকিস্তানের লিবিয়ান সৈনিকদের প্রশিক্ষণদানের কারণে নিজস্ব নিরাপত্তাজনিত কারণে সুদান পাকিস্তানকে সমর্থন দিতে বিরত থাকে। তবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মতো পাকবাহিনীর সামরিক হস্তক্ষেপকে সমর্থন দেননি। নিমেরি দায় সারানো গোছের একটি বিবৃতি দেন, যা ৪ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশ করে। এতে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক জাতিরই বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার আছে।'

পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে সুদান ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানায় এবং পাক-ভারত সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহরের পক্ষে মত দেয়।[২৮] জাতিসংঘে সুদানি স্থায়ী প্রতিনিধি অন্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর সঙ্গে একযোগে ভূমিকা রাখেন। যদিও ৫ ডিসেম্বর একই দাবির পাশাপাশি সুদানি স্থায়ী প্রতিনিধি El Awd বলেন, সুদান পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।[২৯] এ বিবৃতির মাধ্যমে এতোদিন সুদান যে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিল তা থেকে দূরে সরে আসে। যদিও এ সময় জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উঠলে সুদান এর পক্ষে ভোট দেয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধে সুদান সরকার পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে।

অন্যান্য আফ্রিকান রাষ্ট্র

আলজেরিয়া

আলজেরিয়া সরকার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় একমাস পর্যন্ত মৌন থাকলেও ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট বুমেদিন প্রথম সরকারি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ঐদিন তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দেয়া এক পত্রে পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৩০] পরের মাসগুলোতেও আলজেরিয়া তার এ ধরনের মনোভাব অব্যাহত রাখে। নভেম্বর মাসের ১ তারিখে আলজেরিয়ার নবম বিপ্লবী দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আল মাদানি বলেন, তাঁর

দেশ সকল দেশের আঞ্চলিক সংহতি ও সকল জাতির ঐক্যে বিশ্বাসী।[৩১] যদিও সামরিক হস্তক্ষেপকে আলজেরিয়া সমর্থন করেনি।

ঘানা

আফ্রিকার মুসলিম ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোও বড় দেশগুলোর মতো পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সঙ্কটে সমবেদনা জানায় এবং ইয়াহিয়া সরকারকে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান বের করার আহ্বান জানায়।[৩১]

মরক্কো

মরক্কো প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দেশগুলোর মতো পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেয়। ১৪ এপ্রিল মরক্কোর ইশতিয়াক লাল পার্টি এক বিশেষ সম্মেলনের এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।[৩২] মরক্কোর সরকারি প্রতিক্রিয়াও এ সময় জানা যায়। এপ্রিলে মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাবাতে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এ.এইচ.বি. তায়াজিকে ডেকে পাঠান। তাঁকে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার সকল উদ্যোগে মরক্কোর সমর্থনের আশ্বাস দেন।[৩৩] জুলাই মাসে মরক্কোর দৈনিক '*L' Opinin*' মন্তব্য করে 'তথাকথিত বাংলাদেশ শুধু ভারত ও ইসরাইল ছাড়া কোনো রাষ্ট্র মেনে নেবে না।' এর থেকে সরকারের পাশাপাশি পত্রিকাগুলোর মনোভাব জানা যায়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্রও পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিল। মরক্কোর প্রভাবশালী সংগঠন যুব মুসলিম রেনেসাঁ সংস্থা শুরু থেকেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা জানায়। ১৭ এপ্রিল সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মোছলেম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতেই এই রাষ্ট্রটি সর্বদাই ঔপনিবেশিক, এহুদীবাদ ও হিন্দু চক্রান্তের লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। কেননা এশিয়ার এই অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক মোছলেম রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে তাহারা বরদাস্ত করিতে পারে না। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ জানে যে, ধর্মীয় ঐক্যের মধ্যেই পাকিস্তানের শক্তি নিহিত এবং এই কারণেই তাহারা উহার আদর্শ ও ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছে।[৩৫]

মরক্কোর সমর্থন লাভের জন্য ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে ভারত সফর করেন পাকিস্তানের নিযুক্ত জাতিসংঘে প্রতিনিধি দলের নেতা পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহম্মদ আলী। তিনি সেখানে সরকার ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ২৮ নভেম্বর *আজাদ* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার ও রাজনৈতিক মহল ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়েছে।

এছাড়া গাম্বিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়ার সরকারও পত্রপত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম আফোরিবাটা ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রেরিত এক বার্তায় আশাবাদ ব্যক্ত করে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবে।[৩৫] এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অন্যান্য রাষ্ট্র পাকিস্তানপন্থি দেশগুলোর মতো ঘানা পাকিস্তানকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়নি।[৩৬] গাম্বিয়া কিছুটা বিলম্বে জুলাই মাসে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ মাসের ৩ তারিখে প্রেরিত এক পত্রে গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট Dawda Jawara পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৩৪] উগান্ডা একাত্তরের পুরো সময়জুড়ে রাজনৈতিক সঙ্কট থাকায় এ দেশটি পাকিস্তানের ব্যাপারে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট ইদি আমিন অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছাড়াও তাঞ্জানিয়ার সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তবে ইসরাইলের সহায়তায় ক্ষমতা গ্রহণের কারণে এবং ইসরাইলের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থানের কারণে ইদি আমিন পাক সামরিক জান্তার সামরিক অভিযানের পক্ষে কোনো বিবৃতি দেননি। বরং ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের এক লাখ রুপি সাহায্য দেন।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস মিসর সরকারিভাবে পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে মতামত দিলেও বেসরকারি পর্যায়ে এবং গণমাধ্যমগুলোর অধিকাংশ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে ২৫ মার্চ থেকে পরিচালিত গণহত্যার প্রতি কখনো মিসর সমর্থন বা পক্ষে কোনো বিবৃতি দেয়নি। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দেশগুলোর মতো মিসর পাকিস্তানকে অস্ত্র সহযোগিতা বা সমর্থনের কোনো অঙ্গীকার করেনি। এ সময় মিসর নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। মিসরের সঙ্গে রাশিয়ার ২৭ মে সম্পাদিত ১৫ বছর মেয়াদি বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি থাকায় মিসরের বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার সুযোগ ছিল না।

মধ্যপন্থি মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের বিষয়ে অভিন্ন মত প্রকাশ করলেও অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, জনমত, গণমাধ্যমের কারণে কিছুটা বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তবে লিবিয়া সমাজতন্ত্র ও ন্যায়নীতির কথা বললেও স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও অস্ত্র সহায়তা দেয়। মূলত ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই কর্নেল গাদ্দাফি ছিলেন কমিউনিস্টবিরোধী। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন তাঁর বিপ্লব কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন তাঁকে আরো পাকিস্তানপন্থি করে তোলে।

তথ্যসূত্র :

১ *Asia Recorder*, 14-20 May 1971, No-XVII, No-2, p.10161
২ *Morning News* (Karachi), 31 March, 1971
৩ *Ibid*, 15 April 1971
৪ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ জুন ১৯৭১; আরো দ্রষ্টব্য *Hindustan Standard*, 8 June 1971
৫ *Statement*, 15 June 1971
৬ *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No.3, 1971, p.73
৭ Shre Ram, Sharma, *India Annual*, p.330 আরো দ্রষ্টব্য *Kessing Contemporary Archive*, Vol-XVIII, 1971-1972, p.24684
৮ এ সফর সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Asgar Ali, 'Bangladesh and Muslim World', *United Asia*, Vol-23, 3 May-June 1971, p.193
৯ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১১ আগস্ট ১৯৭১
১০ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১
১১ *Radio Pakistan Bulletin*, 13 April 1971
১২ উদ্ধৃত *Morning News*, 9 April 1971
১৩ *Pakistan Horizon*, Vol-XXIV, No-2, 1971, pp. 67-68
১৪ এ এস এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৫, পৃ. ৬২৭
১৫ *Financial Times*, 19 October 1971
১৬ *দৈনিক আজাদ*, ৩১ মার্চ ১৯৭২
১৭ *Financial Times*, Ibid
১৮ *Pakistan Horizon*, Vol-XXV, No-1, 1972, p. 177
১৯ *দৈনিক আজাদ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ দ্রষ্টব্য
২০ হাসান হাফিজুর রহমান *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ১৩ খণ্ড, পৃ.৯৬৯-৯৭৪
২১ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১
২২ *Pakistan Horizon*, Vol-XXV, No-1, 1972, p. 110
২৩ BBC, SUB, Second Series, ME 3858, 7 December, in Ranjit Kumar, *Islamic Cooperation and Unity, Socio political economic and military Relation with special reference to Pakistan Libiya and Sudan*, New Delhi, 1973, p.14
২৪ Document SI 10460 Letter 16 December 1971 from the representative of Libiya Arab Republic, to General SCDR, 26th Year Supplement January-December 1971, p.113
২৫ *Kessings Contemporary Archives*, Vol. XVII, 1971-72, p.24683

২৬ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৫ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.৯৬৯-৯৭৪
২৭ *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুন ১৯৭২। যদিও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রাখার কারণে সেখানকার পাকিস্তানি দূতাবাস তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করে।
২৮ Document, Statement of the Government of Sudan, *Pakistan Horizon*, Vol.XXV, No.1, 1972, p.176 আরো দ্রষ্টব্য *The Dawn,* 12 December 1971
২৯ *Al-Ayyam* (Khantoom), 6 December 1971
৩০ *IDSA News Review on Pakistan* (New Delhi), April 1971, p.29
৩১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ নভেম্বর, ১৯৭১
৩২ *Pakistan Horizon*, Vol. XXIV, No.2, 1971, p. 160
৩৩ *Ibid*, p. 67-68
৩৪ *Dawn*, 29 April, 1971
৩৫ *দৈনিক আজাদ*, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১
৩৬ ঐ, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১
৩৭ *Ibid*, 21 July 1971

প রি শি ষ্ট

জাকার্তা টাইমস-এ মুক্তিযুদ্ধ

Is Islam Dead?

When Muslims kill Muslims in hundreds and thousands, can Islam be alive? This question should be given a serious thought by the Muslim World in the broad context of the present situation in East Pakistan. Account of eye-witnesses, reports of foreign correspondents who left or were forced lo leave East Pakistan since a reign of terror was let loose in that wing of Pakistan, and horrifying tales by the affected East Pakistanis who are crossing over to the Indian border, indicate that the situation in East Pakistan is really very distressing. President Yahya Khan's Government in West Pakistan has been claiming that 'calm' prevails in the region and the situation is 'under control'.

If it is really so, why were the foreign correspondents expelled from East Pakistan? Why was International Red Cross not allowed to visit Dhaka with relief goods for the innumerable sufferers?

And why are foreign nationals being evacuated from that part?

Planes, tanks, mortars, cannons and machine-guns are reportedly being indiscriminately used to quell the so-called secessionist unarmed East Pakistanis. No mercy is being shown even to women and children. To complete the process of destruction, more troops and arms and ammunitions are being sent to East Pakistan.

East Pakistan has a population of 75 million as against 55 million in West Pakistan. There are more Muslims in East Pakistan than in West Pakistan. If East Pakistan eventually becomes an independent state, it would be the second largest Muslim state in the world next only to

Indonesia. East Pakistani people are known to be devoted Muslims. Alcoholic drinks, floorshows and night clubs etc. are banned in East Pakistan. Drinking. dancing, stripteasing etc. are popular in the glamourous cities of West Pakistan inhabited by industrialists, businessmen, military rulers and other similar fortunate classes. If politicians, thinkers, teachers, students, doctors, engineers and even un-armed civilians including women and children are wiped out in East Pakistan, will not the Muslim World in general suffer? Does Islam permit killing of un-armed Muslims by armed Muslims? Can use of force by the strong minority in suppressing the demand of the unfortunate majority for economic and social justice be justified by Islamic principles?

What is happening in East Pakistan may be national to the military Government of President Yahya Khan, but if East Pakistan ultimately becomes a sovereign state, which the world knows is bound to be, will the present crisis not be a concern to other Muslim states? If a future independent state of East Bengal feels that the Muslim world did not support the right cause of the oppressed but lent support to the oppressors because of their powerful position and refuses to sit together and talk to West Pakistanis in an Islamic forum, the Muslim World will be weak and a great blow will be given to Islam itself. The Muslim states should not believe what President Yahya Khan's military Government in West Pakistan claims or what India says, but should make an independent study of the situation in East Pakistan, and urge President Yahya Khan to stop bloodshed, settle the problem through peaceful political means and transfer power to the legally elected representatives of the people of East Pakistan. It should else be brought to the notice of the ruling junta in West Pakistan that so long as Islam is alive right cannot be suppressed by wrong and weak cannot be oppressed by the strong. Muslim states should act quickly and see that good Muslims are not massacred by fellow Muslims. The International Islamic Organisation should also not be silent spectators in the present situation in East Pakistan but should do whatever is possible within their limited means to stop the genocide and restore peace in the region.

From a reader who asked to have his name withheld.

The DJAKARTA TIMES

April 15, 1971

বাংলাদেশ প্রশ্নে দিল্লি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা, ১৮-২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

Clovis Maksond*
U.A.R.

Mr. Chairman and Friends:
This Conference which has been called by the Gandhi Peace Foundation was overdue if I may so so. Of course the human dimensions of the tragedy of nearly 8 million East Bengalis who have taken refuge in hospitable India has become widespread and to that extent shaken mankind. Stories have been related of the brutality of the Pakistani authorities against the East Bengalis. All of us who have listened to and witnessed a part of this tragedy identity ourselves with the sufferings of the East Bengalis. It becomes imperative that we accelerate the peace of amelioration of the conditions of the East Bengal people.

Yet in identifying ourselves with the humanistic aspect we are only making a projection of an elementary call of duty. An elementary call of duty in these circumstances is not sufficient. The Palestinian refugees are suffering the brutality of Israel and the Jordanians in a similar manner as the people of Bangladesh. For a long time in East Bengal freedom has been deliberately denied. They are being denied their right and urge for full participation in the political, cultural, social and economic uplift of their country. Such a situation must be rectified. We must emphasise that the fate of East Bengal is not and cannot and should not be a part of the India-Pakistan dispute. If unity is to be preserved, it must be on the basis of secularism. To that extent we fully appreciate the urges of people of Bangladesh that they should be free.

---

* Attended the conference as observer

We must equally be concerned about 75 million people of Asia being denied human dignity. This is not on internal matter. It is a matter for the human conscience of the people of the world as a whole. It is true that there has been a struggle and the Bengali people must have freedom as well as equality Sheikh Mujibur Rahman should therefore be released. It is not a political cause but a human cause. In March when free elections took place in both wings of Pakistan many people viewed this development as a purifying process for Pakistan. It was a historic moment. Parliamentary democracy was being established in Ceylon, India and Pakistan on the basis of secularism. We welcomed this development in Pakistan as Bengalis had been discriminated against for many years. A new Pakistan was born after the elections. I think the dignity and equality of Bangalis remains the primary concern of their struggle. It is only in this context that we fight for the right of people to equality in all matters. Friends, we have come here to learn more about this and as I said in the beginning we want to understand. Perhaps our understanding has not been as total as it should be. Our most positive contribution should be that dignity returns to the 8.5 million people of East Bengal who have been driven out of their homes.

Mr. Chairman and Distinguished Delegates:

I came here in my personal capacity. I know the man who is at the head of the Committee and who issued the invitation and I could not refuse. What I am going to say is strictly my personal opinion. I hope it will contribute to the solution of the very grave problem with which this conference is faced. The identity of East Pakistan is of much interest to many Indonesian circles. But I myself was attracted when you came to Jakarta and addressed the Foreign Relations Association on the question of East Pakistan and what you said: Mr. Chairman, at that meeting impressed us very much. You had said: "Friends of Pakistan are friends of India. And Indonesians are friends of Pakistan and friends of India." We had in mind the undivided Pakistan.

If one hopes to solve this problem he must participate in seeking the solution. And, therefore, we have supported wholeheartedly that the Conference come out with a solution. At one time there was a talk in Jakarta between two friends–one Indonesian and the other from West

Pakistan. The Indonesia said that the most dangerous thing was the arrest of Sheikh Mujibur Rahman. The Pakistani friend agreed.

Mr. Chairman, I do not agree that Bangladesh is a domestic problem of Pakistan. It that as the theory, Indonesia would not have come into being.

I want to tell you a story which is now history. And sometimes this is also called one of the very few successes of the United Nations. It is the story of the successful U.N. intervention in the problem of Indonesia. U.N. intervention can take the form of good offices, not necessarily mediation which has the deciding power. Good offices bring with it more power and supported by public opinion of the world. I think this is one of the ways we have to pursue. There was a conflict between the Dutch and the Republic of Indonesia. May be that conflict was is a sense different from the tragedy in East Pakistan. But I think in the long run it is the same thing. If a situation in some country is a threat to international peace, it cannot remain an internal problem. It is clear that the situation in East Pakistan is a threat to international peace. It can develop into much graver thins. There is no reason why the United Nations and Security Council should not interfere. In Indonesia's case the Dutch claimed that it was an internal question of the Dutch Empire but the Security Council was not of the same opinion and it appointed a Committee of good offices. The presence of the Committee in our country at that time was very useful. So I would submit this idea to the conference. I think that in this case India is not the proper country to bring the issue before the United Nations. There will be many sympathetic countries who would be willing to do this job.

V. David
Malaysia

Mr. Chairman and Fellow Delegates:
I bring the warmest getting's from the people of Malaysia to this International Conference on Bangladesh. We have come here to show our feelings and express our solidarity with the just struggle of the people of Bangladesh. We are here to be with you, to sharpe your views and express our concern at the horror and massacre in Bangladesh during March 1971. At this juncture I am sure my colleague will share with me the feeling that never was much information regarding

Bangladesh available in Malaysia. Our Government has been absolutely silent on this issue. But the people are concerned. They want to see freedom flourish in Bangladesh. There haw been many schools of thought. Some believe that it is a war between Pakistan and India. Others believe that in Bangladesh the people are fighting for freedom. If we respect the right of self-determination then no nation and no people can remain silent on the rights of the people of Bangladesh. Secondly, if at all there is a leader with whom anyone would like to talk about Bangladesh, he is the rightful and popularly elected democratic leader, Sheikh Mujibur Rahman. If peace and prosperity is to be preserved in Asia, then he should be immediately released and any talks that are to be conducted should be conducted by any power with him.

We in Malaysia are perturbed and disturbed at the manner the United States has been behaving. Though the people of the United States on many occasions during the last few months have expressed support to the people of Bangladesh, the Nixon Administration his been playing a very cunning role and this exposes beyond any doubt all talk of the right of self-determination in the United States. So long as it suits its purpose it is prepared to coma forward. Here the basic issue is humanism. This butchery and massacre of the people and this horrible situation need to be condemned and we people from Malaysia will stand with the peoples of Bangladesh in their just and fair struggle to live as a free people.

M. Soorian
Malaysia

We in the Democratic Action Party Malaysia are a little surprised that our Government leaders think that the Bangladesh affair is still an internal problem of Pakistan.

Bangladesh, having declared independence, is no longer a part of Pakistan. Bangladesh complies with all international norms and conditions in the set-tip of its independence. It has all the requirements of sovereignty that a country requires for such a start.

It has well defined boundaries and commands absolute loyalty of its population. It has its own national government over all braches of civil administration. It has linguistic and racial homogeneity. In the recent election, Sheikh Mujibur Rahman or the Awami Legue won 167 of 169

seats for the Constituent Assembly—which is about 99%.

The birth or Bangladesh was formally aptised at Mujibnagar in East Bengaladesh on 17th April 1971 by the nation-nouveaux's acting President Sayed Nazrut Islam. History was made with the unfurling of the Bangladesh flag to the accompaniment of Tagore's "Amar Sonar Bangla". The acting President pointed out that the funtion was designed to show to all and sundry that the provisional Government did not exist on paper.

This ritual was attended by officials of the Government, including members of the National Assembly, T.V. cameramen and foreign correspondents and over 10,000 freedom fighters, Article 20(3) or the Universal Declaration of Human Rights says that the "will of the people shall be the basis of the authority or Government; this Will, shall be expressed with periodic and genuine elections and shall be held by secret vote or by equivalent voting procedure" But unfortunately the will of the people, which should be the basis of the Government, was not respected. Instead military might was unleashed to crush the aspirations of the people, but what Yahya Khan and Co overlooked is the fact that although you may kill some people you cannot kill the will of self-assertion and self-respect. Exterminating the dissenters does not solve the problem. For every Sheikh Mujibur Rahman that is imprisoned there are 10 others to take his place and fight the cause just same.

The sub-paragraph in the preamble of the Article 20 (3) of the Universal Declaration of Human Rights, which speaks about equal rights of ...men and women also reaffirms 'faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human persons". The Universal Declaration of Human Rights also lays down in its preamble that member-States have pledged themselves to achieve "the promotion of universal respect for an observance of human rights and fundamental freedom" Therefore, the saga of Bangladesh is not and cannot be construed as an internal matter. Racialism was being practised and fundamental human rights were being denied. This matter is of international concern. If the United Nations was entitled to intervene in South Africa, then intervention in East Bangal could have been equally, if not more, justified. It is ironical that Mr. Bhutto who was shouting at the top of his head at the United Nations against repression of the African majorities who are seeking liberation in Rhodesia and South Africa, is pursuing methods which are no different from those of Ian Smith and John Vorster. This is a case of the kette calling the pot black.

Can it be regarded that the systematic annihilation and terrorisation of defenceless civilian population of Bangladesh by the West Pakistan junta fall exclusively within the internal jurisdiction of Pakistan, so that the other nations of the world have no moral or legal obligation to check these excesses?

It is difficult to be a passive spectator to the outrageous inflictions imposed on one race by another as is going on in Bangladesh. What in actual effect Yahya Khan is practising is genocide which has been declared a crime under International Law. The UN General Assembly in 1948 laid down that genocide is a crime and persons responsible for it are punishable under International Law. If Pakistan has any international obligation to observe human rights, any breach of such an obligation cannot be dismissed simply as an internal problem.

The West Pakistan action constitutes a threat to international peace and security. Under Article 39, Chapter VII of the Charter, the UN has a direct obligation to determine the existence of any such breach of the peace and has equally an obligation to decide what measures it should take in accordance with Articles 41 and 42 to maintain or restore international peace and security. This part of the world has now become another Vietnam and that it is ironical again that West Pakistan which has eloquent in denouncing the killing in Vietnam, should mow down by machine-gun fire in four days more civilians than have been killed in four years in Vietnam.

The holocaust in Bangladesh has cost the inevitable spill-over of refugees into India. Over 8 million have fled to India. This number in increasing the rate of about 40,000 daily a poor country and the refugee problem should be tackled by the nations of the world in a concerted manner. It is gratifying to note that the Scandinavian countries have offered money to the refugees but this is not enough. The floods in West Bengal have aggravated the situation.

It is hoped that our meeting would be fruitful and not an exercise in futility. We want to see result—tangible results.

We recommend:

1. The immediate unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman.
2. The with drawl of all Yahya's troops from Bangladesh.
3. The recognition of Bangladesh as a separate foreign sovereign Stats. To this end, we urge—
   (A) Application of pressure on Ceylon and UK to stop the use

of Colombo and Maladive Islands for the ferrying of troops to Bangladesh.

(B) Mass media of India should be turned on full blast to play Bengali sentimental songs to the freedom lighters of Bangladesh.

All India Radio should broadcast intermittent statements on current developments on the border so as to give further moral support.

(C) The super-powers should be actively persuaded to try initially the gentle art of persuasion on Yahya Khan and his henchmen to stop insensate killing.

(D) The Scandinavian countries have given money to help the refugees. Please of help should also be made to the Red Cross and other International Bodies for similar monetary and medical aid.

গ্র ন্থ প ঞ্জি

Unpublished Research Documents and Thesis

Chowdhury, Rashid ul Ahsan, "United States Foreign Policy in South Asia. The Liberation Struggle in Bangladesh and the Indo-Pak War 1971" (This thesis, Hawaii University of Hawaii, 1989)

Javed, Nasim Ahmed, "Islam and Political Attitudes in Pakistan and Bangladesh A Thematic and Quantities Approach" (California University of California, 1974)

Zaman, Tufa, "Bangladesh and the organisation of Islamic Conference 1971 - 1988 (M. Phil. thesis, New Delhi, June, 1989)

Book

Ahmed, Emajuddin, *Foreign policy of Bangladesh - A small States Imperative*, Dhaka UPL, 1984

Ahmed, Fakruddin, *Critical Times Memoirs of A Small Asian Diplomat,* Dhaka UPL, 1994

Ahmed, Syed Salahuddin, *Foreign Policy of Pakistan A Critical Study*, Karachi Faridi Book, Centre, 1990

Anderson, Jack, *The Anderson Papers,* New York Random House, 1973

Baba, Noor Ahmed, *Organization of Islamic Conference, Theory and Practice of Pan-Islamic Cooparation*, Dhaka, UPL, 1994

Barands, William J and others, *Pakistan The Long View,* Durham Dhaka University Press, 1977

Denis Wright, *Bangladesh Origins and Indian Ocean Relations (1971-1975)*

Dhaka : Academic Publishers, 1988

Jackson, Robert, *South Asian Crisis,* New Delhi, *Vikas, 1978*

Kessing Contemporary Achieves, Vol. XVIII, Vol. XXIV, 1971-72

O'Donnell, *Charles Peter, Bangladesh Biography of a Muslim Nation, London,* East view Press, 1984

আবুল ফজল শামসুজ্জামান *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ*, ঢাকা : ত্রিভূজ প্রকাশনী, ১৯৮৪

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ - দলিলপত্র* ৪র্থ, ৫ম, ১৩তম, ১৪তম খণ্ড, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, ১৯৮৫
